ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ
মো. খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
জাফর সাদিক চৌধুরী, *সাবেক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. গোলাম মোস্তফা, *সাবেক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মাহমুদ হাসান তালুকদার, *সাবেক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. আলী হোসেন, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা (খন্ডকালীন)
তমালিকা পাল, ইন্টার্ন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত তথ্যদাতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যমকর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত এবং গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণে টিআইবি'র সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলমের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদনের গুণগতমান উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সহকর্মীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯,
৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৫

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ৬

১.১ প্রেক্ষাপট
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৪ গবেষণা পরিধি

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি ১১

২.১ গবেষণা পদ্ধতি
২.২ তথ্যের উৎস
২.৩ গবেষণার এলাকা ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন
২.৪ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
২.৫ তথ্যের সত্যতা যাচাই ওমান নিয়ন্ত্রণ
২.৬ গবেষণার সময়কাল
২.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
২.৮ প্রতিবেদন কাঠামো

তৃতীয় অধ্যায়: দলিল নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও নিবন্ধন পদ্ধতি ১৪
৩.১ দলিল ও দলিল নিবন্ধন
৩.২ দলিল নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচিতি
৩.৩ দলিলের ধরন
৩.৪ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল
৩.৫ দলিল নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র
৩.৬ দলিল নিবন্ধন ফি
৩.৭.দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়: ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা প্রদানে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ২৩
৪.১ আইন, পদ্ধতিগত, প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা
৪.২ অবকাঠামোগত ঘাটতি
৪.৩ লজিস্টিকস ঘাটতি
৪.৪ বাজেট ঘাটতি
৪.৫ নিবন্ধন সেবায় ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি
৪.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ
৪.৬ দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদান

পঞ্চম অধ্যায়: ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ৩১
৫.১ দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতা
৫.২ দলিল নিবন্ধন সেবায় জবাবদিহিতা

ষষ্ঠ অধ্যায়: ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় শুদ্ধাচার চর্চা ৩৬
৬.১ দলিল নিবন্ধন সেবায় বিদ্যমান দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগ
৬.২ দলিল রেজিস্ট্রেশনে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন
৬.৩ প্রতারণা
৬.৪ জালিয়াতি

৬.৫ দায়িত্ব পালনে অবহেলা
৬.৬ আত্মসাৎ
৬.৭ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার অন্যান্য চাপ
৬.৮ কমিশন করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি
৬.৯ সময়ক্ষেপণ
৬.১০ সেবাগ্রহীতাদের অন্যান্য হয়রানি

সপ্তম অধ্যায়: দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ , ফলাফল ও প্রভাব **৫০**
৭.১ দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ
৭.২ দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল
৭.৩ দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ **৫৩**
৮.১ উপসংহার
৮.২ সুপারিশ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দলিলের আইনগত নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সরকারের নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের ৪৯৭টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল নিবন্ধনের কাজ সম্পাদিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিবন্ধন সেবার মান উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতির নানা চিত্র উঠে আসে। ইতিপূর্বে পরিচালিত টিআইবি'র একাধিক গবেষণায় ('সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ', 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' ইত্যাদি) ভূমি নিবন্ধন সেবায় অনিয়ম-দুর্নীতির কিছু খন্ড চিত্র উঠে এসেছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে এই সেবার ওপর সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে নিবিড় গবেষণার অভাব রয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি খাত নিয়ে টিআইবি'র চলমান গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়, যেখানে বিস্তারিতভাবে ভূমি নিবন্ধন সেবায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিরাজমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমির দলিল নিবন্ধন সেবা জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়া সত্ত্বেও এই সেবার যুগোপযোগী মান উন্নয়নে আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে ভূমি দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির পাশাপাশি আইনি কাঠামোতে কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা, আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা, হালনাগাদ খতিয়ান সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে নিয়মিত সরবরাহ না হওয়া, প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল, লজিস্টিকস ও আর্থিক বরাদ্দ এবং দুর্বল অবকাঠামো ও ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি ইত্যাদি কারণে এই সেবাখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। দলিল নিবন্ধনে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এই আর্থিক দুর্নীতির সাথে বিভিন্ন অংশীজনের পারস্পরিক যোগসাজশ থাকায় অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা কাঠামো যথাযথভাবে কাজ করছে না এবং এর প্রতিটি পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করছে। সেবাগ্রহীতারা সময়ক্ষেপণসহ নানা ধরনের অনিয়ম, হয়রানি এবং আর্থিক দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকায় ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সেবার ন্যায় ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা নিশ্চিতে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিবেচনার জন্য এ প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেছে।

গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত মহাপরিদর্শক-নিবন্ধন, বিভাগীয় পরিদর্শক, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারগণ, দলিল লেখক, সেবাগ্রহীতা, গণমাধ্যমকর্মী, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণার খসড়া ফলাফল উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য আমরা মহাপরিদর্শক-নিবন্ধন জনাব খান মোঃ আব্দুল মান্নান-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ গবেষণার খসড়া ফলাফলের ওপর তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামত ও পরামর্শ গবেষণাটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রতিবেদন প্রনয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক শাম্মী লায়লা ইসলাম ও নিহার রঞ্জন রায়। তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ এন্ড পলিসি। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ এন্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - রিসার্চ এন্ড পলিসি এই গবেষণা কার্যক্রমে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি আশা করে, এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। দলিল নিবন্ধন মূলত একটি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত নিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয়।[১] দলিল নিবন্ধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা; সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে সর্বসাধারণকে জ্ঞাতকরণ বা প্রচারের সুবিধা; জালিয়াতি রোধ; কোন সম্পত্তি পূর্বে হস্তান্তরিত হয়েছিল কি না তা অনুসন্ধানে তথ্য-ভান্ডার থেকে সহায়তা প্রদান; এবং স্বত্বের দলিলের নিরাপত্তা প্রদান এবং মূল দলিল খোয়া গেলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মূল দলিলের অস্তিত্ব প্রমাণার্থে সহায়তা প্রদান করা।[২]

ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এ দেশের মানুষ দলিল নিবন্ধন সম্পর্কে অবগত ছিল না। কারণ প্রাচীনকালে লোকজনের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত এবং তাঁদের পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের ভিত্তি ছিল বিশ্বাস এবং উন্নত নৈতিকতা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানুষের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এ দেশ শাসন শুরুর প্রাক্কালে ব্রিটিশরা যখন জনগণের কাছে নিজেদের বৈধতা অর্জনের জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বিরাজমান থাকায় স্বার্থান্বেষী লোকজন অনেকের জমি বেআইনীভাবে দখল করাসহ সরকারি রাজস্ব প্রদান থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাল-জালিয়াতির আশ্রয়ে ভুয়া দলিল উপস্থাপন করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

এ প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশরা এদেশে তাদের স্বার্থসিদ্ধির পাশাপশি জাল-জালিয়াতি রোধ এবং রাজস্ব আদায় সুশৃংখল করার উদ্দেশ্যে দলিল নিবন্ধন প্রথা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বিষয়টি এ দেশের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিধায় নিবন্ধন আইন আকস্মিকভাবে প্রচলন না করে ধীরে ধীরে জনসাধারণকে এ পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রথম দিকে দলিল নিবন্ধীকরণ ঐচ্ছিক রাখা হয় এবং কতিপয় নিবন্ধিত দলিল অনিবন্ধিত দলিলের বিবেচনায় অগ্রগণ্য হবে- এমন বিধান রাখা হয়। এছাড়া নিবন্ধন কার্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে সময় সময় প্রাদেশিক আইন জারি করা হয়। এসব প্রাদেশিক আইনের মধ্যে প্রথমটি হল ১৭৮১ সালের বেঙ্গল স্টাটিউট। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ১৭৯৩ সনের ৩৬নং বেঙ্গল রেজুলেশন, ১৮০২ সনের ৪নং বোম্বে রেজুলেশন এবং ১৭নং মাদ্রাজ রেজুলেশন। ১৭৯৩ সনের ৩৬নং বেঙ্গল রেগুলেশনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ঢাকায় রেজিস্ট্রার অফিস স্থাপন করা হয়। সময়ের সাথে সাথে নিবন্ধন পদ্ধতি কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ব্যতীত অব্যাহত থাকে এবং সাধারণ মানুষ এর উপকারিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়ায় সুবিধাজনক সময়ে প্রাদেশিক আইনের পরিবর্তে সমগ্র ভারতে সাধারণ আইন জারি করা হয়। সাধারণ আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৬৪ সনের ১৬নং আইন, ১৮৬৫ সনের ২০নং আইন, ১৮৬৬ সনের ২০নং আইন, ১৮৭১ সনের ৮নং আইন, ১৮৭৭ সনের ৩নং আইন এবং ১৯০৮ সনের ১৬নং আইন যা বর্তমান রেজিস্ট্রেশন আইন।

১৮৬৪ সনের ১৬নং আইনে সর্বপ্রথম কতিপয় দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার পদ্ধতি চালু হয় এবং সকল প্রকার দলিলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন: বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল এবং ঐচ্ছিক নিবন্ধনযোগ্য দলিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৬৪ সন পর্যন্ত নিবন্ধন সংক্রান্ত আইনসহ স্বতন্ত্র প্রাদেশিক আইন হিসেবে এবং ১৮৬৫ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য একই আইন চালু ছিল। ১৯৪৭ সনে ইংরেজগণ এই উপ-মহাদেশের শাসনভার ত্যাগ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্যান্য আইনের মত ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনও উভয় দেশে বহাল থাকে। পরবর্তীতে উভয় দেশেই উক্ত আইন প্রয়োজন অনুসারে সময় সময় সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর আইনটি সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে বহাল থাকে উক্ত আইনে উল্লেখিত দলিলসমূহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়।[৩]

---

[১]বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-২০১৭, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন:
http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

[২] উপক্রমনিকা, নিবন্ধন ম্যানুয়াল ২০১৪।

[৩] প্রাগুক্ত

জমি বা সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে রেজিস্ট্রেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯০৮ সালের আইনে বলা ছিল যে স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং যে সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার উর্ধ্বে যে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূল ছিল, পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন সংশোধন করার মাধ্যমে মূল্য নির্বিশেষে স্থাবর সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রিযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি না হলে ঐ দলিল নিয়ে কোনো আদান-প্রদান প্রমাণিত হয় না। রেজিস্ট্রিবিহীন দলিলের কোনো মূল্য নেই। দলিলের নির্ভুলতার ওপর ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্ত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪] ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী মূল্য নির্বিশেষে সব ধরণের সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮ এর ১৭ ধারা মতে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য দলিলগুলো হচ্ছে: মূল্য নির্বিশেষে সব ধরণের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সাফ কবলা দলিল; হেবা/দানপত্র দলিল; বন্ধকী দলিল; সম্পত্তির বাটোয়ারা দলিল; বায়না চুক্তির দলিল; এওয়াজ বদল দলিল; আমমোক্তারনামা; উইল ইত্যাদি।

রেজিস্ট্রেশন বিভাগ দলিল নিবন্ধন ও সম্পাদনের কাজটি করে থাকে। রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুযায়ী দলিল নিবন্ধন কার্যক্রম নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এটি পূর্বে পরিদপ্তর ছিল এবং ২০১৮ সালের ২ জানুয়ারীর একটি প্রজ্ঞাপনমূলে নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।[৫] এ অধিদপ্তরের অধীন সারা দেশে ৪৯৭টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস নিবন্ধন কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করছে। নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত অফিসগুলোতে বিদ্যমান জনবল সংখ্যা ৩৯২৪।[৬] বিগত দুই শতাধিক বৎসর ধরে প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে জমি/সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। জনসাধারণকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে রাজস্ব ও করাদি আহরণ করে থাকে।[৭] দেশের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এটি সরকারের অন্যতম রাজস্ব আহরণকারী উৎস।

দলিল নিবন্ধন সেবা সহজীকরণ এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বক্স-১.১.১: দলিল নিবন্ধন সেবা সহজীকরণ ও নিবন্ধন বিভাগেরকার্যকরতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ[৮]

- **আইনি সংস্কার ও বাস্তবায়ন:** ২০০৫ সালে নিবন্ধন আইন ১৯০৮ এ সংশোধন আনা হয়েছে; এর ফলে দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমের বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে নিবন্ধন বিধিমালা ১৯৭৩ সংশোধনপূর্বক "নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪" প্রস্তুত করা হয়েছে; জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সম্পৃক্ত আইন ও বিধিমালার সংস্কার, সৃজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী বিধিমালা-২০১৫ এবং সর্বনিম্ন বাজারমূল্য বিধিমালা -২০১০ এর অধিকতর সংশোধনী।
- **নাগরিক সনদ ও সেবা মূল্য স্থাপন/টানানো:** প্রতিটি রেজিস্ট্রি অফিসে সিটিজেন চার্টার ও দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প ও আনুসাঙ্গিক কর পরিশোধের হারের তালিকা স্থায়ীভাবে প্রকাশ্য স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **জনবল বৃদ্ধি:** সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা সংকট অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে। সারাদেশে ১৬৭টি সাব-রেজিস্ট্রারের পদ খালি ছিল। ইতিমধ্যে ২০১৬ সালে বিভাগীয় পদোন্নতি পেয়ে ২৪টি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত (নন ক্যাডার) ১১১টি পদ পূরণ করা হয়েছে।
- **ভৌত অবকাঠামো:** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (২০১৭-২০১৮) আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ও ৫৮টি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়সহ মোট ৭২টি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন ব্যস্ততম রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে

[৪] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-২০১৭, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

[৫] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২/১/২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং আর-৬/১এম-২/২০০৫-২, বিস্তারিত দেখুন: http://rd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/rd.portal.gov.bd/notices/6505be65_7a6e_4004_8a8c_da273221b079/11.jpg

[৬] নিবন্ধন পরিদপ্তর ওয়েবসাইট, সাংগঠনিক কাঠামো, বিস্তারিত দেখুন: http://rd.portal.gov.bd/site/organogram/17fa73e8-e49d-4652-bbd7-1fb3ba4931c4/-

[৭] নিবন্ধন পরিদপ্তর ওয়েবসাইট, উদ্দেশ্য, বিস্তারিত দেখুন: http://rd.portal.gov.bd/site/page/5330cae6-fd1f-4ba0-b3ca-ca023422647a/-

[৮] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-২০১৭, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতায় জনবলসহ নতুন তিনটি অফিস সৃজন করা হয়েছে।

- **বালাম বইয়ের সংকট নিরসন:** সারাদেশে বিপুল পরিমাণ দলিলের বকেয়া নকলের কাজ দ্রুত তরান্বিত করার জন্য সরকারি মুদ্রাণালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বালাম বইয়ের সরবরাহ ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৮৫ হাজার এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫০ হাজার বালাম বই সারা দেশে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- **বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ:** ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্ব আদায়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা স্বত্ত্বেও এই বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দেশের সকল জেলার জেলা রেজিস্ট্রার এবং মাঠ পর্যায়ের সকল সাব-রেজিস্ট্রারদের বিশেষ কোর্স প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দুইটি ব্যাচে মোট ৬১ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- **তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া:** দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে 'দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচী আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- **দলিল সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ:** দলিলের গতানুগতিক ভাষা পরিবর্তন করে সহজতর করা হয়েছে। দলিল লেখার ফরমেট চালু করা হয়েছে। দলিল পত্রাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প শুল্কসহ যাবতীয় কর ও শুল্ক পে-অর্ডারে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাফ কবলা দলিল রেজিস্ট্রিতে দাতা/পূর্ববর্তীদের নামে জমির মালিকানার রেকর্ড/নামজারি ও হালসনের খাজনা পরিশোধের দাখিলা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত:** জেলা রেজিস্ট্রারগণ প্রতি ছয় মাস অন্তর জেলার প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, রেজিস্ট্রি অফিসমূহের পরিদর্শকগণ বিভাগওয়ারী নিয়মিত প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রার ও সদরসাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, প্রতি মাসে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন দুই থেকে তিনটি জেলা রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং নির্ধারিত ফরমে পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতি বিভাগীয় নির্দেশনা অনুযায়ী মীমাংশা/গুরুতর অনিয়মের জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ।
- বেসরকারি পর্যায়ে (টিআইবিসহ অনান্য) নানা উদ্যোগ; যেমন-নাগরিক সনদ স্থাপন, সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

এ ধরনের নানা সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের নিবন্ধন সেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম, সুশাসনের ঘাটতি ও নানা সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের (২০১২, ২০১৫, ২০১৭) সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপেও দেখা গেছে যে, দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজে সেবা গ্রহীতাদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। নিচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১২ সালে দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতির শিকার হওয়ার খানার হার ছিল ৩০.১% এবং ২০১৫ ও ২০১৭ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ৪৬.২% এবং ৪২.৫%। এছাড়া জরিপগুলোতে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে দলিল রেজিস্ট্রেশনের বিভিন্ন কাজে তাদের ঘুষ দিতে হয়েছে এবং একইভাবে দেখা যায় যে এই টাকার পরিমাণও বছর অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে এই টাকার পমিাণ ছিল ৬৬৫৩ টাকা, ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে এই অর্থের পরিমাণ হয়েছে ৯৭৭৭ টাকা এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে দেখা যায় এই এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১,৮৫২ টাকা।

সারণি-১.১.১: বছরভেদে টিআইবি'র সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপ অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রেশনে দুর্নীতির চিত্র

সাল	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
২০১৭	৪২.৫	১১,৮৫২
২০১৫	৪৬.২	৯,৭৭৭
২০১২	৩০.১	৬,৬৫৩

অপরদিকে, ২০১৫ সালে প্রকাশিত টিআইবির "ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবাকার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণায়ও জমির দলিল নিবন্ধনে নানা দুর্নীতি অনিয়মের চিত্র উঠে এসছে। এ গবেষণায় বলা হয়েছে যে, সাব-রেজিস্ট্রারদের একাংশ দলিল লেখকদের সাথে যোগসাজশ রক্ষা করে চলে এবং ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে (যেমন জাল দলিল, দলিলে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি) জড়িয়ে পড়ে; দলিল লেখকদের একাংশ ক্রেতাদের জমির প্রকৃতি পরিবর্তন ও প্রকৃত ক্রয় মূল্য থেকে কম মূল্য দেখাতে উৎসাহিত করে এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে কম রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে; দলিল লেখকদের ওপর সাব-রেজিষ্ট্রারদের নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব থাকলেও তাদের বিধি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড

নজরদারি করা হয় না; দলিল লেখকরা দলিল লেখার জন্য সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে উচ্চহারে ফি গ্রহণ করে। এছাড়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে।

অপরদিকে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে দেশের ৯টি এলাকার ৯টি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ওপর টিআইবি পরিচালিত বেজলাইন প্রতিবেদনেও নিবন্ধন সংক্রান্ত নানা দুর্নীতি অনিয়মের চিত্র উঠে এসেছে। এই বেজলাইন তথ্য সংগ্রহকালে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা জানিয়েছেন যে, ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তারা খুব বেশি জানেন না। তারা জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য মূলত দলিল লেখকের ওপর নির্ভর করেন। এছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন ফি'র বিষয়ে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের সিংহভাগই জানেন না। অফিস কক্ষের তথ্যবোর্ডে এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য থাকলেও সেবাগ্রহীতাদের কেউ তা অনুসরণ করেন না সচেতনতার ঘাটতির কারণে। সাধারণ সেবাগ্রহিতারা দলিল বা দলিলের নকল কোথা থেকে, কিভাবে তুলতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সরকার নির্ধারিত 'ফি' কত সে বিষয়ে সচেতন নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা জমির রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল লেখকদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য প্যাকেজ আকারে আর্থিক চুক্তি করেন। সেবাগ্রহীতা নিজেও জানেন না যে তিনি এই কাজে কত টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্রদান করছেন। কেননা দলিল লেখকরা তার পারশ্রমিক বাবদ কত নিলেন এবং রেজিস্ট্রেশন বাবদ সরকার নির্ধারিত 'ফি' কত দিলেন তা সেবাগ্রহীতাদের কাছে প্রকাশ করেন না। ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মীদের সাথে ভূমি মালিকদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয় না। এই কাজটি করে থাকেন দলিল লেখকরা। ভূমি মালিক দলিল লেখকের সাথে যোগাযোগ করেন ভূমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য। তারা সমঝতার ভিত্তিতে একেক জনের কাছ থেকে একেক ধরনের 'ফি' নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, দলিল লেখকদের এই টাকার ভাগ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মীরা পান। এছাড়া সেবাগ্রহীতাদের অধিকাংশের দেওয়া তথ্যানুসারে জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তারা দলিল লেখকদের প্রতি ১ লক্ষ টাকায় ১২%-১৩% হারে অর্থ প্রদান করেছেন। তবে সেবাগ্রহীতাদের একাংশ জানিয়েছেন যে, দলিল লেখকরা ভূমি রেজিস্ট্রশনে সরকার নির্ধারিত 'ফি' এর চেয়ে ৪%-৫% অতিরিক্ত অর্থ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নিয়ে থাকে। ভূমি রেজিস্ট্রেশনের পর এর দলিল পেতে সেবাগ্রহীতাদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া দলিলের নকল পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয় সেবাগ্রহীতাদের। সরকারি ফি কম দেওয়ার জন্য জমির শ্রেণি (চালা জমি, নাল জমি, ভিটি) ইত্যাদি পরিবর্তন করে জমির মূল্য কম দেখানোর মাধ্যমে জমি রেজিস্ট্রেশন করা হয়। এর জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে জমির শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য টাকা দিতে হয়। জমির প্রকৃত মূল্য কম দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে সরকারি ফির বাহিরে আলাদা করে অর্থ গ্রহন করে। ফলে একেকজন সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা একেকরকম। সাব-রেজিস্টার অফিসে দেরি করে আসেন এবং জমি রেজিস্ট্রেশনের লেট ফি আদায় করেন। জমি রেজিস্ট্রেশনের তারিখ, সময় বারবার পরিবর্তন করে হয়রানি করে। নাম পরিবর্তনে খারিজ না দেখে জমি রেজিস্ট্রেশন করা হয়।[৯]

অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের উপর তৈরী করা সিএজি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে জমি নিবন্ধনের সময় শতকরা ৭৮ ভাগ দলিল সম্পাদনে দুর্নীতি অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে। এ প্রতিবেদনে জমির দাম কম দেখানোর ক্ষেত্রে নেপথ্যে সাব-রেস্ট্রিার অফিসের কারসাজি, বেআইনিভাবে দলিল করা, বিভাগীয় পরিদর্শক, জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রারদেও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে তদারকির অভাবসহ নানা কারণ সনাক্ত করা হয়েছে।[১০] এছাড়া সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা এবং রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে দুর্নীতির ব্যপকতার কারণে নিবন্ধন অধিদপ্তর'কে একটি 'সম্ভাব্য দুর্নীতিপ্রবণ' প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া নিন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর নানা সীমাবদ্ধতার চিত্রও সংবাদপত্রে উঠে এসেছে। এসকল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে জনবল সংকটসহ নানা সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাগণ এ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন না। আর এসব সমস্যার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও যথাযথ সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অফিস ভাড়াসহ এ দুটি অফিস পরিচালনার জন্য সরকার থেকে কোনো বরাদ্দ নেই। তাই সাব-রেজিস্ট্রারকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভাড়া পরিশোধ করতে হচ্ছে[১১]। এছাড়া দলিল লেখক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে সরকারি নিয়ম নির্ধারিত ফি ছাড়াও সেরেস্তা, লেট ফি, কমিশন ফি, খাজনা খারিজে অস্পষ্টতার অজুহাত এবং অফিস খরচের নামে দলিল প্রতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। চাহিদা মত অর্থ পরিশোধ না হলে দলিল সম্পাদন হয় না[১২]। অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই শক্তিশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন করা হয়। ফলে জাল/ভুয়া দলিল সম্পাদিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে[১৩]।

---

[৯] ৯টি বেজলাই প্রতিবেদন, টিআইবি, ২০১৫-২০১৭

[১০] '৭৮ ভাগ জমির দলিল নিবন্ধনে কারসাজি', ***দৈনিক সমকাল***, ১৪ জানুয়ারি, ২০১৬।

[১১] 'গাইবান্ধা সদর সাব-রেজিস্টি অফিস নানা অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া' ***দৈনিক জনকন্ঠ***, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬

[১২] 'গাইবান্ধা সদর সাব-রেজিস্টি অফিস নানা অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া' ***দৈনিক জনকন্ঠ***, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬

১৩ 'কাপাসিয়া সাব-রেজিস্টি অফিসে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ' ***দৈনিক ইত্তেফাক***, ২১ অক্টোবর, ২০১৭

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রথমত, দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে জনবান্ধব সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে দেশের নিবন্ধন অধিদপ্তর ও এর অধীন জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। দ্বিতীয়ত, ভূমি খাতের ওপর বিভিন্ন গবেষণায় ভূমি দলিল নিবন্ধনে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র আংশিকভাবে উঠে আসলেও সুনির্দিষ্টভাবে এই সেবার ওপর সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে নিবিড় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। তৃতীয়ত, ভূমি খাত টিআইবির কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের ভূমি সেবা খাত নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা (বেইজ লাইন জরিপ, রিপোর্ট কার্ড জরিপ, জাতীয় খানা জরিপ, ডায়াগনোস্টিক স্টাডি ইত্যাদি) এবং তার আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ভূমি সেবা খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়, দলিল নিন্ধনের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের নিবন্ধন অধিদপ্তর তথা নিবন্ধন অফিসগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণাটি নিবন্ধন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন নিবন্ধন অফিসগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ভূমি দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. ভূমি দলিল নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
২. ভূমি দলিল নিবন্ধন কার্যে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রভাব নিরূপণ করা
৩. ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৪ গবেষণা পরিধি

দেশে যেসকল ধরনের দলিল নিবন্ধিত হয় তার অধিকাংশ ভূমি সংক্রান্ত। এ গবেষণায় শুধুমাত্র ভূমি সংক্রান্ত নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে সম্পাদিত ভূমি বা সম্পত্তি নিবন্ধন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে নিকাহ রেজিস্ট্রেশন এবং বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণার ধরন

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.২ তথ্যের উৎস

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এলাকার জেলা রেজিষ্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী (অফিস সহকারি, মোহরার, টিসি মোহরারসহ অন্যান্য), রেকর্ড কীপার, নকলনবীশ, দলিল লেখক, স্ট্যাম্প ভেন্ডর, আইনজীবী, সেবাগ্রহীতা (ক্রেতা-বিক্রেতা), সহকারি কমিশনার ভূমি, তহশীলদার, সার্ভেয়ার, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা (স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে), ব্যাংক কর্মকর্তা, রিয়েল এস্টেট প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, মহা পরিদর্শক-নিবন্ধন অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন। মোট ৪০৫ জন তথ্যদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অপরদিকে পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধন অধিদপ্তর, জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, সংবাদ ও প্রবন্ধ।

২.৩ গবেষণার এলাকা ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

এ প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলায় "জেলা রেজিস্ট্রার অফিস" এবং এই ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের অধীনে ৪৯৭টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কাজ করছে। তথ্য সংগ্রহের এলাকা ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে, দেশের আটটি বিভাগ থেকে মোট ১৬টি (প্রতিটি থেকে দুইটি করে) জেলার রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্যে এক বছরে সম্পাদিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দলিল নিবন্ধনের সংখ্যার ভিত্তিতে দুইটি করে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৬টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্যে থেকে কমপক্ষে দুইটি এবং কোথাও কোথাও তিনটি করে মোট ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্যে এক বছরে সম্পাদিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দলিল নিবন্ধনের সংখ্যার ভিত্তিতে দুইটি করে মোট ৩২টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া অবস্থান ও বৈচিত্র্যগত (জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবনে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলায় নিবন্ধন সংখ্যার বিবেচনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, নদী ভাঙন এলাকা, সীমান্তবর্তী এলাকা ইত্যাদি) গুরুত্ব বিবেচনায় আরো ৯টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়েও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন- সাক্ষাৎকার, ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে (সারণি ২.৪.১)।

সারণি-২.৪.১: প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	জেলা রেজিষ্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী (অফিস সহকারি, মোহরার, টিসি মোহরারসহ অন্যান্য), রেকর্ড কীপার, নকলনবীশ, দলিল লেখক, স্ট্যাম্প ভেন্ডর, আইনজীবী, সেবাগ্রহীতা (ক্রেতা-বিক্রেতা), সহকারি কমিশনার ভূমি, তহশীলদার, সার্ভেয়ার, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা (স্থানীয় ও	৪০৬ জন

		জাতীয় পর্যায়ে), ব্যাংক কর্মকর্তা, রিয়েল এস্টেট প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, বিভাগীয় পরিদর্শক- নিবন্ধন অধিদপ্তর, মহা পরিদর্শক- নিবন্ধন অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য	
পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	গবেষণাভুক্ত জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ	

২.৫ বিশ্লেষণ কাঠামো

এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও শুদ্ধাচার) আলোকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েকটি জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে সম্পাদিত ভূমি বা সম্পত্তি নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সক্ষমতার মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বরাদ্দের বিষয়গুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধীনে তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, নিবন্ধন সংক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ, নকলনবীশ ও দলিল লেখকদের জবাবদিহিতা ও তদারকি, অফিসগুলোর সার্বিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচারের মধ্যে নিবন্ধন সেবা নিতে আসা ব্যক্তিদের হয়রানি, বিদ্যমান দুর্নীতি-অনিয়মের ধরন ও কারণ সম্পর্কে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি-১.৪.১: এ গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশক ও উপ-নির্দেশক

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক	উপ-নির্দেশখ
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	আইনি সক্ষমতা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, আর্থিক বরাদ্দ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (জনবল, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি)
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ ব্যবস্থা
জবাবদিহিতা	তদারকি, নিয়ন্ত্রণ (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি) ও শৃঙ্খলা বিধান, নিরীক্ষা, ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার চর্চা, দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ নিবন্ধন সেবা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন তথা সকল জেলা রেজিস্ট্রার, সাব- রেজিস্ট্রার, মোহরার, অন্যান্য কর্মচারী, নকল নবীশ, দলিল লেখক, সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে দলিল নিবন্ধন সেবায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

২.৬ তথ্যের সত্যতা যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে এবং এসব তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সার্বক্ষণিকভাবে মাঠে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা হয়।

২.৭ গবেষণার সময়কাল

২০১৮ সালের জুলাই থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণায় ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যদাতারা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এসকল তথ্য পাওয়া গেলে এ প্রতিবেদনটি আরো সমৃদ্ধ হত।

২.৯ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট আটটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থার ইতিহাস, বিবর্তন, উল্লেখযোগ্য অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্মপরিধি ও এখতিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থার সাথে

জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে অধস্তন দলিল নিবন্ধনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি, অনিয়ম ও সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ-প্রভাব-ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে অষ্টম অধ্যায়ে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধ এবং সুশাসনের ঘাটতি হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
দলিল নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও নিবন্ধন পদ্ধতি

৩.১ দলিল ও দলিল নিবন্ধন

দলিল বলতে যে কোন চুক্তির লিখিত ও আইনগত রূপ বোঝায়। সম্পত্তি বিশেষ করে জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয়, বণ্টন এবং হস্তান্তরের জন্য 'দলিল' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি দলিলে বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এর মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির বর্ণনা, দাতার পরিচয়,গ্রহীতার পরিচয়, সাক্ষীদের পরিচয় এবং দলিল সম্পাদনের তারিখ ইত্যাদি। দলিল সম্পাদনের পর এর আইনি বৈধতার জন্য সরকারের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে[১৪]। দলিল সম্পাদনের জন্য সরকারকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদান করতে হয়।

৩.২ দলিল নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন পরিচিতি

দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া মূলত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সম্পাদিত হলেও দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়াসহ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সার্বিক কার্যক্রম জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকি হয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমে নিবন্ধন অধিদপ্তর, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের পরিচিতি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

নিবন্ধন অধিদপ্তর: ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নিবন্ধন অধিদপ্তর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ব্যতীত এ অধিদপ্তরের অধীন দেশের ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ৪৯৭টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৬ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত অফিসগুলোতে বিদ্যমান জনবল সংখ্যা ৩ ,৯২৪। ২০১৮ সালে ৪৯১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। নিবন্ধন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে উল্লেখযোগ্য জনবলের মধ্যে আছে - একজন মহা-পরিদর্শক; একজন সহকারী মহা-পরিদর্শক; ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জন্য ছয়জন পরিদর্শক (রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ দুটি নতুন হওয়ায় এ দুটির জন্য এখনও স্থায়ীভাবে পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়নি); একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা; প্রশাসনিক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (টিসি শাখা); একজন প্রধান সহকারী এবং সাতজন উচ্চমান সহকারী (শাখা প্রধান)[১৫]।

---

[১৪]বিস্তারিত দেখুন: https://bn.wikipedia.org/wiki

[১৫]সিটিজেন চার্টার, নিবন্ধন অধিদপ্তর

চিত্র-৩.২.১:নিবন্ধন অধিদপ্তর-এর অর্গানোগ্রাম

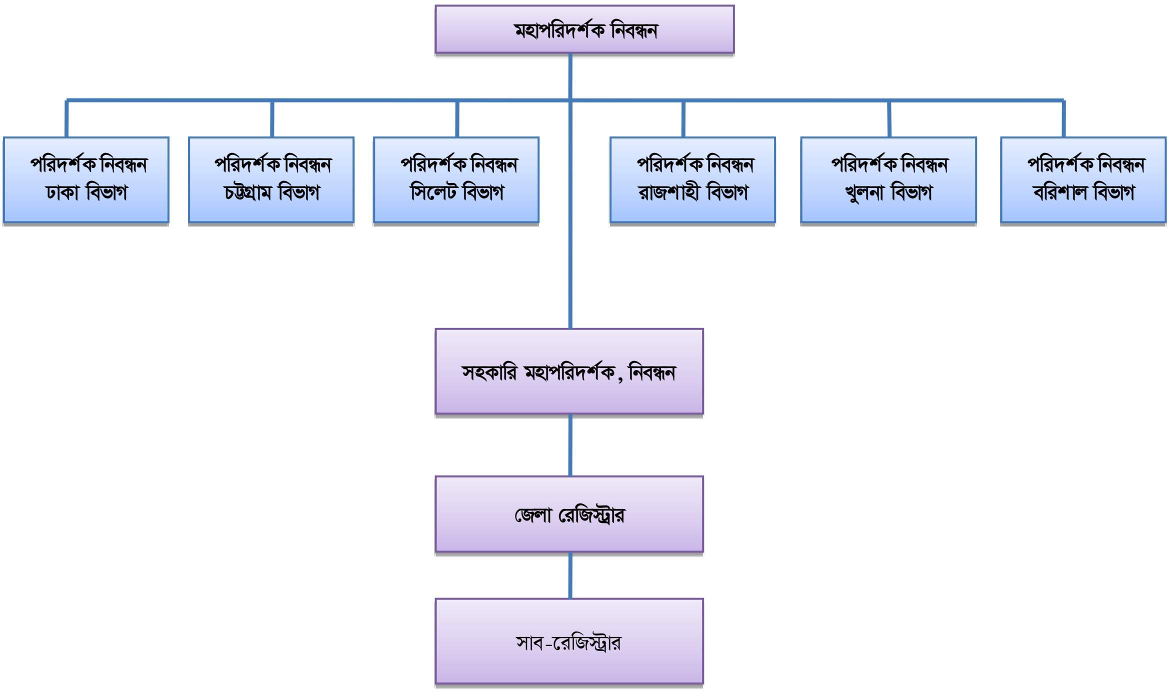

নিবন্ধন অধিদপ্তর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে এই অধিদপ্তর জেলা রেজিস্ট্রার কার্যলয় এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি করে। এর মধ্যে রয়েছে-দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান; জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে দলিলের নকল বা তথ্য সংগ্রহে সমস্যা নিরসন; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ; কর্মকর্তা-কর্মচারী, অফিস সংশ্লিষ্ট দলিল লেখক ও নকলনবীশগণের অনিয়ম বা দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা নির্ধারণ ইত্যাদি। জনসাধারণকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে রাজস্ব ও করাদি আহরণ করে থাকে। বিগত তিন অর্থ বছরে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সারণি-৩.২.১: নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ[১৬]

অর্থবছর	দলিল সংখ্যা	রেজিস্ট্রেশন আয় (টাকা)	স্থানীয় সরকার কর (টাকা)	মোট রাজস্ব আয় (টাকা)
২০১৪-২০১৫	৩৪,১৯,৫৪২	৮৭৯২,৮০৬০,২৮২	১৯৬০,২৫২৩,৮১৯	১০৭৫৩,০৫,৮৪,১০১
২০১৫-২০১৬	৩২,৬৩,৪৯৫	৯৪৭৯,৪১,৫২,২৮৬	১৬৪৫,৫৪,৪১,০১৫	১০৯২৬,৯৩,০৭,৮৬৬
২০১৬-২০১৭	৩১,৯৮,৯২০	৫০৫২,৫৬,৩৩,০১৮	৩২৬৭,৮৭,২৩,৭৮৪	৮৩২০,৪৩,৫৬,৮০২
২০১৭-২০১৮	৩৬,৭২, ৪২৮	১০১২৯,৮৪,২৮,০৯৯	২৩০৩,৭৫,৪৪,৬২৩	১২৪৩২,৯৯,৭২,৭৩১

জেলা রেজিস্ট্রার অফিস: ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুসারে সরকার কর্তৃক দেশের প্রতিটি জেলাতে একটি করে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস স্থাপনের বিষয়ে বলা হয়েছে[১৭]।জেলা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তত্ত্বধান করা হয়। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলার সকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধনের কপি ও নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র এখানে সংরক্ষণ করা হয়। জেলা রেজিস্ট্রারগণ নিবন্ধকের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের অধীনে থাকা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নীরিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করে। “জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে জনবলের মধ্যে আছে - একজন জেলা রেজিস্ট্রার; একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সদর রেজিস্ট্রেশন রেকর্ডরুম); একজন প্রধান সহকারী; একজন রেকর্ড

[১৬]বিস্তারিত দেখুন: http://www.rd.gov.bd/site/page/b7ad77c1-213d-49bf-ae15-9ddf3b9b1261/-
[১৭] রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, ধারা ৭(১)

কিপার; একজন অফিস সহকারী; একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর; টি.সি. সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর; একজন এম.এল.এস.এস এবং একজন নৈশপ্রহরী[১৮]"।

জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বা সমস্যা সমাধান; জেলা সদর বা উপজেলা পর্যায়ে দলিলের নকল বা তথ্য সংগ্রহে সমস্যা নিরসন; জেলা সদর বা উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নকলনবীশ বা দলিল লেখকদের অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করা; জেলার নিকাহ রেজিস্ট্রারদের (কাজী) অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নকলনবীশ ও দলিল লেখকদের অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করা।

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস: ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন আনুসারে সরকার কর্তৃক দেশের প্রতিটি উপজেলায় এক বা একাধিক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস স্থাপনের বিষয়ে বলা হয়েছে[১৯]। প্রধানত, স্থানীয় পর্যায়ে দলিল নিবন্ধনের চাহিদা সাপেক্ষে কোনো কোনো উপজেলায় একাধিক সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আছে। এছাড়া উপজেলার বাইরে দেশের মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে এলাকাভিত্তিক সব-রেজিস্ট্রি অফিস রয়েছে (যেমন-ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে খিলগাঁও, মোহাম্মদপুর, গুলশান, ধানমন্ডি, মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ইত্যাদি)। মূলত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে জনবলের মধ্যে আছে - একজন সাব-রেজিস্ট্রার; একজন অফিস সহকারী; দুইজন মোহরার; একজন টি.সি. মোহরার এবং একজন পিয়ন। এছাড়া প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রয়োজন অনুসারে নকলনবীশ ও দলিল লেখক আছে।

সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যেসব কাজ সম্পাদন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দলিল নিবন্ধন; দলিল নিবন্ধনের জন্য গ্রহণের পর বালামে দলিলের নকল লিপিবদ্ধ করা এবং স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ; নিবন্ধনের পর মূল দলিল ফেরত প্রদান; দলিলের নকল বা তথ্য সংগ্রহে সহয়তা প্রদান; সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে সহয়তা প্রদান; মূল দলিল সংগ্রহে সহয়তা প্রদান এবং যে কোন আবেদন বা দরখাস্ত লেখার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল নিবন্ধন ও বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ আবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিম্নে অন্যান্য অংশীজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন

নকলনবিশ: নকলনবিশরা নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বানুমতি সাপেক্ষে কোনো নিবন্ধন কার্যালয়ে অনুলিপি কাজ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে নিয়োজিত হয়ে থাকেন। এরা মূলত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক কর্মী। সারা দেশের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে প্রায় ১৫,০০০ জন নকলনবীশ কাজ করছেন। মূলত দলিলের নকল অনুলিপি প্রস্তুতের জন্য নকলনবিশরা নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। বাংলায় দলিলের প্রতি ৩০০ শব্দবিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশবিশেষের জন্য ২৪ টাকা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ শব্দবিশিষ্ট ১ পৃষ্ঠা বা এর অংশবিশেষ লেখার জন্য ৩৬ টাকা পেয়ে থাকেন। নকলনবিশগণের অনুলিপি কাজ বাবদ নির্ধারিত অর্থ সাব-রেজিস্ট্রার বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী আদায় করেন[২০]।

দলিল লেখক: দলিল লেখকরা দলিলের খসড়া প্রস্তুতের কাজ করে থাকেন। সাধরারণত কোনো দলিল নিবন্ধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দলিল প্রস্তুতের সকল কাজ তারা করে থাকেন এবং সেবাগ্রহীতারা এদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হন। দলিল লেখক হিসেবে কাজ করার জন্য তাদের লাইসেন্স নিতে হয়। কোনো জেলার যে কোনো ব্যক্তি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের এলাকার আওতাভুক্ত, যার বয়স কমপক্ষে ২১ বছর; যিনি স্বীকৃত কোনো বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; যিনি এলাকায় প্রচলিত স্থানীয় ভাষায় দলিলের ভাল মুসাবিদা করতে পারেন; যার হাতের লেখা সুন্দর; ১৮৮২ সনের ভূমি হস্তান্তর আইন, ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৯৯ সনের স্ট্যাম্প আইন এবং ১৯০৮ সনের নিবন্ধন আইন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ সম্বন্ধে যার ব্যবহারিক জ্ঞান আছে এবং যার আচরণ ভাল; এবং যিনি সচ্চরিত্রের অধিকারী, তিনি নিবন্ধন আইনের ৮০ছ এ উল্লেখিত দলিল লেখকের কাজ করবার সনদেও জন্য প্রশংসাপত্র (যদি থাকে) সরাসরি জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর অথবা সাব-রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট ফরমে লিখিতভাবে আবেদন করতে

[১৮]সিটিজেন চার্টার, নিবন্ধন অধিদপ্তর

[১৯]রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, ধারা ৭(১)

[২০] নকলনবিশগণের অনুলিপি কাজ বাবদ অর্থ আদায় ও পরিশোধকরণ বিধিমালা, ২০১৮, এস. আর. ও নং-২০০-আইন/২০১৮

পারেন এবং তা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক দলিল লেখকের সনদ লাভ করেন[২১]। সারা দেশে প্রায় ২০,০০০ দলিল লেখক কাজ করছেন।

সারণি-৩.২.২: দলিল লেখকদের জন্য নির্ধারিত সরকারিফি[২২]

প্রতি ৩০০ শব্দ বা তার অংশ মুসাবিদার জন্য	১৫ টাকা
মুসাবিদা হতে দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রির বিষয়ে যাবতীয় সহায়তাকল্পে প্রতি ৩০০ শব্দ বা তার অংশে বিশেষের জন্য	১০ টাকা
স্মরণ শক্তি হতে দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রির বিষয়ে যাবতীয় সহায়তাকল্পে প্রতি ৩০০ শব্দ বা তার অংশ বিশেষ হলে	১৫ টাকা
পক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মূল দলিল ফেরৎ গ্রহণ	৫ টাকা
ছাপানো ফরম বা অন্য রকম যাবতীয় দরখাস্ত লিখন ও পূরণ	৫ টাকা
প্রতিটি সমন লিখন ও পূরণ	২ টাকা
স্যাট অ্যাক্ট এর নোটিশ নোটিশ লিখন ও পুরণ করার জন্য নোটিশ প্রতি	২ টাকা
সূচি তল্লাশি বা বালাম বহি পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর প্রতি ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির জন্য	৫ টাকা

দালাল: অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দালালের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে প্রবেশের পূর্বেই এদের খপ্পরে পড়ে। এরা নিবন্ধন সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সেবাগ্রহীতাদের সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় এবং এসব কাজের জন্য তারা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্যাকেজ আকারে অর্থ নিয়ে থাকে। এরা সেবাগ্রহীতাদের নির্দিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি দলিল নিবন্ধন, দলিলের নকল উত্তোলন, পুরানো দলিল তল্লালি ইত্যাদি কাজে সাব-রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারীদেরকে ঘুষ প্রদানের নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে থাকে যা সেবাগ্রহীতাদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। এদের সাথে সাব-রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, নকলনবীশ, দলিল লেখকদের একাংশের সাথে যোগাযোগ থাকে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দলিল লেখক, নকলনবিশ, স্ট্যাম্প ভেন্ডর এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারীদের একাংশ দালাল হিসেবে কাজ করে।

সেবাগ্রহীতা: যারা বিভিন্ন ধরনের দলিল সম্পাদন, দলিলের নকল উত্তোলন, বিভিন্ন দলিল ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই ও তল্লাশীর জন্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আসেন তারা ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবার সেবগ্রহীতা হিসেবে পরিচিত।

৩.৩ *দলিলের ধরন*

সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়, উত্তরাধীকার সূত্রে, দান, আদালতের ডিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। দলিলের ধরন নির্ভর করে সম্পত্তির হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ও ধরনের ওপর। বিভিন্ন ধরনের দলিলের মধ্যে রয়েছে সাফ-কবলা, দানপত্র, হেবা, হেবা বিল এওয়াজ, এওয়াজ, বন্টননামা, উইল, না-দাবি এবং বায়নাপত্র দলিল ইত্যাদি। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দলিল দলিল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সাফ-কবলা দলিল: কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি অন্যের নিকট বিক্রয় করে যে দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে দেন তাকে সাফ-কাবলা বলা হয়। এই দলিল নির্ধারিত দলিল ষ্ট্যাম্পে লেখার পর দলিল দাতা অর্থাৎ বিক্রেতা সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে উপস্থিত হয়ে দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করে ক্রেতার নামে নিবন্ধন করে দেন। দলিল নিবন্ধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলিলের বিক্রিত সম্পত্তির যাবতীয় স্বত্ব দলিল দাতা হতে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রেতা ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।

দানপত্র দলিল: যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি দান করতে পারেন। দানপত্র দলিলে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই দাতা যে কাউকে সম্পত্তি দান করতে পারে। সম্পত্তির স্বত্ব নিয়ে দাতার কোন প্রকার দাবী থাকলে দানপত্র শুদ্ধ হয় না।

হেবার ঘোষণা দলিল: মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হেবা অর্থাৎ দানপত্র দলিল হয়ে থাকে। এই দলিল কোনকিছুর বিনিময়ে নয়, কেবলমাত্র সন্তুষ্ট হয়ে এ ধরনের দান করা হয়। হেবা দলিলে শর্তবিহীন অবস্থায় দান, বিক্রয় ও রূপান্তর ইত্যাদি সকল ক্ষমতা প্রদানে দান বা হেবা করতে হবে। এই দানপত্রে দাতার কোন স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে না।

[২১] দলিল লেখক (সনদ) বিধিমালা ২০১৪, এস. আর. ও নং-২৭৬-আইন/২০১৪

[২২] https://landregistrationbd.com/2016/08/16/

হেবাবিল এওয়াজ দলিল: হেবা বিল এওয়াজ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি দানপত্র দলিল। যদিও এই দানও সন্তুষ্ট হয়ে করা হয় তবে এতে কোনো কিছুর বিনিময় থাকে। যেমন- পবিত্র কোরআন, জায়নামাজ, তসবিহ, মোহরানার টাকা বা যেকোন জিনিসের বিনিময়েও হতে পারে। এই দলিলের গ্রহীতা সম্পূর্ণ শর্তবিহীন অবস্থায় জমি হস্তান্তর ও রূপান্তর করতে পারবেন এবং দাতার যাবতীয় স্বত্ব গ্রহীতার উপর অর্পিত হয়। এই দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক।

এওয়াজ বদল দলিল: যেকোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে তাদের উভয়ের স্থাবর সম্পত্তি বদলি করতে পারেন। একেই এওয়াজ বা বদল অথবা পরিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতি থাকতে হয় এবং এক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। যেমন- 'ক' এর বাড়ির পাশে 'খ' এর জমি আবার 'খ' এর বাড়ির পাশে 'ক' এর জমি। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের সুবিধার জন্য একজনের সাথে অন্যজনের সাথে সম্পত্তি বদল করা নিমিত্তে দলিল সম্পাদন করে নিবন্ধন করতে পারেন।

বন্টননামা দলিল: কোনো সম্পত্তির মালিকের মৃত্যু হলে তার উত্তরাকারীদের মধ্যে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাটোয়ারা বা বন্টননামা দলিল নিবন্ধন করতে হয়। উত্তরাকারীদের নিজেদের অংশের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বন্টননামা দলিল করতে হয়। একই সম্পত্তির মালিক একই বংশের লোককে সাধারণত শরিক বা হকদার বলা হয়। শরিক দুই ধরনের- ১. উত্তরাধিকার সূত্রে শরিক ২. কোন শরিক থেকে ক্রয় সূত্রে শরিক। বন্টননামা দলিল করার সময় সকল অংশীদারকে দলিলে স্বাক্ষর করে দলিল নিবন্ধন করতে হয়। কোন একজন শরিক বা অংশীদার অনুপস্থিত থাকলে বন্টননামা দলিল শুদ্ধ হয় না।

অছিয়তনামা দলিল: মুসলিম ধর্মের কোনো ব্যক্তি তার সম্পত্তি যে কোনো ব্যক্তিকে বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে প্রদান করলে তাকে অছিয়তনামা বলে। অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধীকারগণ দাবী উত্থাপন করলে যাকে সম্পত্তি অছিয়ত করা হয়েছে তিনি উক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের মালিক সংশ্লিষ্ট সকল উত্তরাধীকাররা হয়ে থাকেন।

উইল দলিল: হিন্দু ধর্মের কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পত্তি ইচ্ছামাফিক যে কাউকে উইল করে দিতে পারেন। তবে যিনি উইল করলেন তিনি যদি একের অধিক উইল করেন তবে সর্বশেষ উইল কার্যকর হয়।

না-দাবি দলিল: কেউ যদি তার প্রাপ্ত সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার নেই বা স্বত্বাধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন এ মর্মে দলিল সম্পাদন করে ও নিবন্ধন করে দেন তাহলে তাকে না-দাবি দলিল বলা হয়।

বায়নাপত্র দলিল: কোনো সম্পত্তি বিক্রির জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তিপত্র করা হয়, তাকে বায়নাপত্র বলে। এটি নিবন্ধন করতে হয়। কেননা এর মাধ্যমেও মালিকানা স্বত্ত্ব হস্তান্তর হতে পারে। যদি বিক্রেতা বায়নাপত্রে জমির দখল বুঝিয়ে দেন এবং মূল্যের টাকা গ্রহণ করেন এবং বিশেষ কারণে দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে দেননি বা দিতে পারেননি এমতাবস্থায়ও উক্ত সম্পত্তি আংশিক বিক্রয় কার্যকর হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। নিবন্ধন ছাড়া বায়না দলিলের আইনগত মূল্য নেই।

আদালতের মাধ্যমে সাফ কবলা দলিল: গ্রহণযোগ্য বায়নাপত্র নিয়ে কেউ আদালতে নালিশ করে আদালত কর্তৃক দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সব ঠিক থাকলে আদালত দাতার পক্ষে স্বাক্ষর করে ক্রেতাকে দলিল নিবন্ধন করে দেন[২৩]।

৩.৪ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল

১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে বলা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন করতে হয় এবং যে সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার অধিক সেই সম্পত্তি ১৯০৮ সালের আইনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ভূমি নিবন্ধন আইন সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মূল্য নির্বিশেষে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর হলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০০৫ সালে সংশোধিত এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইনে কোন কোন দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক তা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিবন্ধন না হলে ঐ দলিল নিয়ে কোনো আদান-প্রদান প্রমাণিত হয় না। সাধারণভাবে যে সকল দলিল বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে- মূল্য নির্বিশেষে সকল ধরনের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সাফ-কবলা দলিল; হেবা/দান দলিল/দানপত্র; বন্ধকী দলিল; উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্পত্তির বাটোয়ারা দলিল; বায়না চুক্তির দলিল; এওয়াজ বদল দলিল; আমমোক্তারনামা; ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ত্ব আইনের ধারা ৯৬ এর অধীনে আদালতের মাধ্যমে ডিক্রী দলিলের নিবন্ধন; এবং উইল[২৪]।

---

[২৩]বিস্তারিত দেখুন: https://bn.wikipedia.org/wiki

[২৪] রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, ধারা ১৭

৩.৫ দলিল নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র

দলিল নিবন্ধনের জন্য সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও নথিপত্রের প্রয়োজন। কোন স্থাবর সম্পত্তির সাফ-কবলা বা বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ও নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে - (ক) বিক্রেতা যদি উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত অন্যভাবে সম্পত্তির মালিক হলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন তার নামে প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ খতিয়ান; (খ) বিক্রেতা যদি উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে সম্পত্তির মালিক হলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন তার নামে অথবা তার পূর্বসূরির নামে প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ খতিয়ান; (গ) সম্পত্তির প্রকৃতি; (ঘ) সম্পত্তির মূল্য; (ঙ) সীমানা ও চৌহদ্দিসহ সম্পত্তির একটি নকশা; (চ) সম্পত্তির মালিকানার গত ২৫ বছরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; এবং (ছ) এই দলিল সম্পাদনের পূর্বে সম্পাদনকারী সম্পত্তিটি কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন নি এবং এই সম্পত্তিতে তাহার বৈধ স্বত্ব বহাল রয়েছে মর্মে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা সম্পর্কিত একটি হলফনামা[২৫]।

এছাড়া দলিলে দাতা ও গ্রহীতার পিতা-মাতার নাম, পূর্ণ ঠিকানা এবং সম্প্রতিক ছবি সংযুক্তি; জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মসনদ পত্র জমির সিএস, এসএ, ও আরএস রেকর্ডে মালিকানার ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কার পরে কে মালিক ছিল তার উল্লেখ এবং প্রয়োজনে বায়া দলিল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিআইএন সনদ সংযুক্ত করতে হয়[২৬]।

৩.৬ দলিল নিবন্ধন ফি

নিবন্ধন আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, আয়কর আইন, অর্থ আইন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি এবং পরিপত্রের আলোকে বিভিন্ন দলিল নিবন্ধন হয়। সব দলিলের নিবন্ধন ফি সমান নয়। সরকার বিভিন্ন সময় সমসাময়িক বিবেচনা অনুযায়ী নিবন্ধন ফি নির্ধারণ করে থাকে। নানা ধরনের ভূমি দলিল নিবন্ধনের মধ্যে অধিকাংশ বিক্রয় বা সাফ-কবলা দলিল সম্পর্কিত। এ পর্যায়ে সাফ-কবলা দলিলসহ গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি দলিলের নিবন্ধন ফি[২৭] পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো:

সাফ-কবলা দলিল: সাফ-কবলা দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফি রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

(১) নিবন্ধন ফি: সাফ-কবলা দলিলের নিবন্ধন ফি হস্তান্তরিত সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যের ২% টাকা। দলিলের মূল্য ২৪,০০০ টাকা বা তার কম হলে নগদ অর্থে এবং ২৪,০০০ টাকার বেশি হলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে নির্দিষ্ট কোড নম্বরে (১৪২২২০১) জমা করতে হয়।

(২) স্ট্যাম্প শুল্ক: হস্তান্তরিত সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যের ৩% টাকা। দলিলে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যাবে। স্ট্যাম্প খাতের বাকি অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে নির্দিষ্ট কোড নম্বরে (১১৬২১০২) জমা করতে হয়।

(৩) স্থানীয় সরকার কর: সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যের ৩% টাকা। স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হিসাব নম্বরে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হয়।

(৪) উৎস কর: জেলা সদরের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ২% টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দলিল মূল্যের উপর ১% টাকা।

(৫) অন্যান্য ফিসসমূহ:

ক) ২০০ টাকার স্টাম্পে হলফনামা।

খ) ই ফি - ১০০ টাকা।

গ) এন ফি-

- বাংলায় প্রতি ৩০০ (তিন শত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ১৬ টাকা।
- ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিন শত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা।

ঘ) এনএন ফি (নকলনবিশগনের পারিশ্রমিক) -

- বাংলায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা।
- ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ৩৬ টাকা।

ঙ) সম্পত্তি হস্তান্তর নোটিসের আবেদনপত্রে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি।

---

[২৫] নিবন্ধন ম্যানুয়াল ২০১৪, ধারা ৫২(ক), পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪

[২৬]জমি-জমার কথা, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), পৃষ্ঠা-৩০ এবং http://sr.kumarkhali.kushtia.gov.bd/, *Viewed on 19 August, 2019*

[২৭] http://sr.kumarkhali.kushtia.gov.bd/, *Viewed on 19 August, 2019*

হেবার ঘোষণা: হেবার ঘোষণা, ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি ১০০ টাকা। স্ট্যাম্প শুল্ক ২০০ টাকা। অন্যান্য ফি-এর মধ্যে রয়েছে ২০০ টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামা, ই-ফি ১০০ টাকা, এবং সম্পত্তি হস্তান্তর নোটিশের আবেদনপত্রে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি প্রয়োজন হয়। এছাড়া, বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ১৬ টাকা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা। নকলনবীশদের পারিশ্রমিক হিসেবে এনএন ফি বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা এবং এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ৩৬ টাকা প্রযোজ্য।

হেবাবিল এওয়াজ: হস্তান্তরিত সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যের ২% পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হয়। স্ট্যাম্প শুল্ক- হস্তান্তরিত সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যের ৩%। দলিলের মূল্য ২৪,০০০ টাকা বা তার কম হলে নগদ অর্থে এবং ২৪,০০০ টাকার বেশি হলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে নির্দিষ্ট কোড নম্বরে (১৪২২২০১) জমা করতে হয়। দলিলে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যায়। স্ট্যাম্প খাতের বাকি অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক-এ নির্দিষ্ট কোড নম্বরে (১১৬২১০২) জমা করতে হয়। স্থানীয় সরকার কর সম্পত্তির দলিলে লিখিত মোট মূল্যেও ৩% টাকা যা স্থানীয় সোনালী ব্যাংক-এ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হিসাব নম্বরে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হয়। উৎস কর জেলা সদরের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ২% টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দলিল মূল্যের উপর ১% টাকা। অন্যান্য ফি-এর মধ্যে রয়েছে ২০০ টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামা, ই-ফি ১০০ টাকা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর নোটিশের আবেদনপত্রে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি প্রয়োজন হয়। এছাড়া, বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ১৬ টাকা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা। নকলনবিশদের পারিশ্রমিক হিসেবে এনএন ফি বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা এবং এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ৩৬ টাকা প্রযোজ্য।

বায়না দলিল: বায়না দলিল নিবন্ধনের ফি নির্ভর করে জমির মূল্যের ওপর। জমির মূল্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৫০০ টাকা, ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১০০০ টাকা এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে ২০০০ টাকা নিবন্ধন ফি'র প্রয়োজন হয়। নিবন্ধন ফি পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক-এ জমা করতে হয়। স্ট্যাম্প শুল্ক ৩০০ টাকা। অন্যান্য ফি-এর মধ্যে রয়েছে ২০০ টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামা, ই-ফি ১০০ টাকা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর নোটিশের আবেদনপত্রে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি প্রয়োজন হয়। এছাড়া, বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ১৬ টাকা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা। নকলনবিশদের পারিশ্রমিক হিসেবে এনএন ফি বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা এবং এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ৩৬ টাকা প্রযোজ্য।

বন্টননামা দলিল: বন্টননামা দলিল নিবন্ধনের ফি নির্ভর করে জমির মূল্যের ওপর। বন্টনকৃত সম্পত্তির দলিলে (বৃহত্তম এক পক্ষের অংশের মূল্য বাদ দিয়ে) মোট মূল্য জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৫০০ টাকা, ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭০০ টাকা; ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১২০০ টাকা, ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১৮০০ টাকা এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে নিবন্ধন ফি ২০০০ টাকা নির্ধারিত আছে। নিবন্ধন ফি পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক-এ জমা করতে হয়। স্ট্যাম্প শুল্ক ৫০ টাকা। অন্যান্য ফি-এর মধ্যে রয়েছে ২০০ টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামা, ই-ফি ১০০ টাকা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর নোটিশের আবেদনপত্রে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি প্রয়োজন হয়। এছাড়া, বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ১৬ টাকা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা। নকলনবিশদের পারিশ্রমিক হিসেবে এনএন ফি বাংলায় প্রতি ৩০০ শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৪ টাকা এবং এবং ইংরেজি ভাষায় প্রতি ৩০০ (তিনশত) শব্দ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ৩৬ টাকা প্রযোজ্য।

৩.৭ দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি

সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বিভিন্ন ধরনের দলিল নিবন্ধন হয়ে থাকে। এর মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিবন্ধন অধিক সংখ্যায় হয়ে থাকে। এখানে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সাফ-কবলা দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এলাকায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত সেই সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করতে হয়। যে ক্ষেত্রে দলিলভুক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের আওতায় থাকে তখন যে কোন একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল রেজিস্ট্রি করা যাবে। তবে যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত নয় সে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে দলিল রেজিস্ট্রি হলে দলিলের পক্ষবৃন্দ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না[২৮]।

---

[২৮]জমি-জমার কথা, এএলআরডি, পৃষ্ঠা-৩১

এ ধরনের দলিল সম্পাদনের পূর্বে একজন ক্রেতাকে উক্ত সম্পত্তির বা জমির বর্তমান খতিয়ান এবং কমপক্ষে বিগত ২৫ বছরের দলিল অর্থাৎ সম্পত্তির হস্তান্তর হওয়ার তথ্য যাচাই করতে হয়। জমির হালনাগাদ খাজনার দাখিলা যাচাই করতে হয়। জমির মালিকানার সূত্র, জমিটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলে সর্বশেষ জরিপের খতিয়ানে জমিটির মালিকের নাম, খতিয়ানে বিক্রেতার নাম না থাকলে যার আছে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিক্রেতা কি সূত্রে সম্পত্তি পেয়েছেন এবং তা যথার্থ কিনা তা যাচাই করা এবং সিএস, আরএস সহ প্রয়োজনে সর্বশেষ জরিপের দাগ এবং খতিয়ান নম্বর যাচাই করা প্রয়োজন। এছাড়া সম্পত্তিটি আগেই অন্যের কাছে বিক্রি করা হয়েছে কিনা এবং সম্পত্তিতে কারো অগ্র-ক্রয়াধিকার আছে কিনা, সম্পত্তি নিয়ে আদালতের কোন মামলা আছে কিনা তাও যাচাই করা প্রয়োজন। এরপর ক্রেতা নিবন্ধন করার মনস্থির করলে নিবন্ধন অফিস হতে জমির দামের তালিকা নিতে হয়। এই তালিকা হতে জমি নিবন্ধনের জন্য কি পরিমাণ টাকা ফি ও ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে তার হিসাব করতে হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা সাপেক্ষে সম্পত্তিটি ক্রয়যোগ্য হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি বায়নাপত্র চুক্তি হয়। একটি জমির মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ টাকা দিয়ে জমি বায়না করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে জমি নিবন্ধন করতে হয়। জমির বায়নাপত্রে এই সময় উল্লেখ থাকে। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (ভেন্ডার) এর কাছ থেকে নির্দিষ্ট ১৫০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প কিনে দলিল লেখকের নিকট বায়নাপত্র লেখাতে হয়। বায়নাপত্র লেখার জন্য চাহিদা অনুযায়ী ফি প্রদান করতে হয়। উক্ত বায়নাপত্রে দাতা, গ্রহীতা, দলিল লেখক এবং ন্যূনতম তিনজন সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রয়োজন। বায়নাপত্র অবশ্যই লিখিত ও ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। বায়নাপত্রে উল্লেখ করা তারিখের মধ্যে দলিল নিবন্ধন করতে হয়। বায়নানামায় উল্লেখ করা তারিখের মধ্যে নিবন্ধন করা না হলে বায়নার টাকা ফেরত পাওয়া যায় না।

চিত্র-৩.৭.১বিক্রয় দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি: ধাপওয়ারি কার্যক্রম

১. হস্তান্তরিত সম্পত্তির স্বত্ব এবং গত ২৫ বছরে হস্তান্তরের তথ্য যাচাই

২. আলোচ্য হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংগ্রহ

৩. দলিলের খসড়া প্রস্তুতকরণ

৪. দলিল নিবন্ধন বাবদ ফি ও শুল্ক জমাকরণ

৫. দলিল সম্পাদন এবং সম্পাদনের ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধনের জন্য মূল পে-অর্ডার, চালান ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ দলিল দাখিল

৬. সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিল সম্পাদনকারী এবং তার সনাক্তকারীর পরিচিতি এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রের বৈধতা যাচাইকরণ

৭. নিবন্ধিত দলিলের বিপরীতে অফিস কর্তৃক প্রদত্ত রশিদটি ক্রেতা রেখে দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর রসিদ দাখিল করে মূল দলিলটি ফেরত নিবেন

৮. দলিলের নিবন্ধন অগ্রাহ্য হলে ক্রেতা মূল দলিল এবং অগ্রাহ্য আদেশের নকল সংগ্রহ করবেন

৯. অগ্রাহ্য আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে ক্রেতা অগ্রাহ্য আদেশের নকলসহ মূল দলিল জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করে মামলা দায়ের করবেন

১০. দলিলটি নিবন্ধনের জন্য আদেশ দেওয়া হলে তা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নিবন্ধিত হবে

বর্তমানে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দলিল লেখা হয়। এজন্য স্ট্যাম্প ভেন্ডর বা ট্রেজারি থেকে একটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কিনতে হয়। একটি সাদা কাগজে দলিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়ার ধরণ নির্ভর করে দলিলের ধরনের ওপর। দলিলে জমির দাগ, খতিয়ান, মৌজা, জমির পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়। দলিলের খসড়া চূড়ান্ত হলে স্ট্যাম্পে লেখা হয়। দলিলে জমির মূল্য উল্লেখ করতে হয়। দলিল রেজিস্ট্রি করার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি দলিলে উল্লেখ করা জমির দামের ওপর হিসাব করে বের করা হয়। তবে সরকার সময় সময় রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি সময়ে সময়ে বাড়াতে-কমাতে পারে। বাংলাদেশে স্ট্যাম্প ও কর সব মিলে রেজিস্ট্রেশন করতে জমির ক্রয় মূল্যের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বিভিন্ন কর ও ফি দিতে হয়[২৬]।

সাধারণত দলিল নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল দাখিল করতে হয়। তবে বিশেষ কারণে সাব-রেজিস্ট্রার তার অফিসের বাইরে কোন ব্যক্তির বাড়িতে বা কোনো অফিস বা কর্মস্থানের ঠিকানায় গিয়ে নিবন্ধনের জন্য কোনো দলিল গ্রহণ করতে পারেন। একে কমিশন বলে। তবে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে সেবাগ্রহীতাকে আবেদন করতে হবে।

দলিল নিবন্ধন করার বা না করার ক্ষমতা সাব-রেজিস্ট্রারকে প্রদান করা হয়েছে। দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তিগতভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হয়ে দলিল সম্পাদন স্বীকার করা সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল সম্পাদন করেন। অন্যদিকে দলিল সম্পাদনকারী কর্তৃক অস্বীকার, সম্পাদনকারী নাবালক, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বা পাগল হন বা মৃত্যুবরণ করেন তবে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন।

সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিলের নিবন্ধন অগ্রাহ্য হলে ক্রেতা মূল দলিল এবং অগ্রাহ্য আদেশের নকল সংগ্রহ করবেন। অগ্রাহ্য আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে ক্রেতা অগ্রাহ্য আদেশের নকলসহ মূল দলিল জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করে আপীল দায়ের করবেন। জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিলটি নিবন্ধনের জন্য আদেশ প্রদান করলে তা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নিবন্ধিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল পত্র ব্যতিত অন্যান্য দলিল পত্র নিবন্ধন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ডিক্রী বা অর্ডার একাধিক সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধনের জন্য দাখিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকার মধ্যে ডিক্রী বা অর্ডার প্রদানকারী আদালত অবস্থিত সেই সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অথবা উক্ত ডিক্রী বা অর্ডার যে এলাকায় অবস্থিত সম্পত্তি সেই এলাকার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধনের জন্য দাখিল করা যায়।

[২৬]ভূমি আইনের সহজপাঠ, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৬৫

চতুর্থ অধ্যায়
ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা প্রদানে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৪.১ আইনি, পদ্ধতিগত, প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

নিবন্ধন আইন ১৯০৮: দলিল নিবন্ধনের বিষয়টি মূলত ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন, নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪ এবং নিবন্ধন ম্যানুয়্যাল ২০১৪ এ লিপিবদ্ধ বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য আইন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ২০০৪ সালে এই আইনটিতে সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয় এবং সেই সংশোধনীর মাধ্যমে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি ও পদ্ধতিগত সমস্যার সমাধান করা হয়। তারপরও কিছু আইন ও এর প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে তথ্যদাতারা তাদের মত প্রকাশ করেন। এ গবেষণায় দেখা যায় যে আইন অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য জমির মালিকানা যাচাইয়ে যে বাধ্যবাধকতা ও পদ্ধতি রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।যেমন-অনেক সময় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে জমির খতিয়ান বা রেকর্ড অব রাইটস এর হালনাগাদ কপি না থাকায় সাব-রেজিস্ট্রারগণ খতিয়ান বৈধ কি অবৈধ তা সহজ যাচাই করতে পারেন না। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৩৫ এর ৪৮৭ বিধিতে বলা আছে যে হালনাগাদকৃত খতিয়ানের প্রকাশিত কপি প্রতিবছর মহা-পরিদর্শক নিবন্ধনের নিকট প্রেরণ করতে হবে কিন্তু এটি নিয়মিত করা হয় না। একইভাবে স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃক স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে হালনাগাদকৃত খতিয়ানের কপি প্রেরণ করার নিয়ম থাকলেও তা নিয়মিত করা হয় না। ফলে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে হালনাগাদকৃত রেকর্ড অব রাইটস থাকে না। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংরক্ষণ সার্ভারে অভিগম্যতা না থাকায় দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত নথিপত্র সঠিক কিনা তা তৎক্ষণাৎ সাব-রেজিস্ট্রারের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয় না। ফলে জাল দলিল তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এছাড়া নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজেশন করার জন্য নিবন্ধন আইন সংশোধন করে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন।

> "...জমি রেজিস্ট্রেশনের সময় দাতা যে পর্চা আমার সামনে উপস্থাপন করছে, সেটা ভেরিফাই করার সুযোগ কিন্তু আমার নাই। ওটা দেখতে গেলে আমাকে বিভিন্ন অফিস থেকে ভেরিফাই করে আনতে হবে, যা সময়-সাপেক্ষ বিষয় হবে। আইন অনুযায়ী যে কাগজপত্র নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন, সেগুলোসহ আমার সামনে উপস্থাপন করলে আমি রেজিস্ট্রেশন করতে বাধ্য। কিন্তু তিনি যে কাগজপত্র আবেদনের সাথে দিচ্ছেন, তা কতটা সত্য তা দেখার সুযোগ তো আমার নেই। কিন্তু জাল কিছু থাকলে দায়টা আমার উপর এসে পড়ছে।"- একজন তথ্যদাতা

এছাড়া, ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা এবং তার কার্যালয়ে দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কনকরণ, নকলকরণ, অনুবাদকরণ বা নিবন্ধীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে ত্রুটিপূর্ণ জেনে কোনো দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ বা নিবন্ধন করেন তবে তিনি অনুর্ধ্ব সাত বছরের কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। আবার একই আইনের ৮৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তার সরকারি পদাধিকার বলে সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু করলে বা না করলে তার জন্য তিনি কোনো মামলা, দাবি বা ক্ষতিপূরণের সম্মুখীন হবেন না। আইনের এই দুটি ধারা একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া ৮৬ নম্বর ধারাটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপব্যবহার করে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৭৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার দলিল সংক্রান্ত প্রদেয় ফিসের তালিকা প্রস্তুত করবে। মূলত এই ধারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিভিন্ন আদেশ জারির মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন ধরনের দলিল অনুযায়ী নিবন্ধন ফিসের মূল্য নির্ধারণ করে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য অনুসারে, বিভিন্ন ধরনের দলিল নিবন্ধনের নির্ধারিত ফিস বিশেষ করে সাফ-কবলা দলিল বা সম্পত্তি বিক্রয় দলিলের ফিস তুলনামূলকভাবে বেশি। কিছু ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের রেজিস্ট্রেশন ফি'র তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণে অনেক সময় সম্পত্তির মূল্য কম দেখানো বা প্রকৃত মূল্য গোপন করার প্রবণতা কাজ করে এবং সেবাগ্রহীতারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিবন্ধন ফি কম করতে চান এবং অনেকে দলিল নিবন্ধন করতে উৎসাহিত হয় না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে কিন্তু নিবন্ধন হয়নি।

বাংলাদেশে সম্পত্তির দলিল নিবন্ধনের সময় প্রদানকৃত সরকারি ফি উপ-মহাদেশের অন্যান্য দেশের দলিল নিবন্ধন ফি'র তুলনায় বেশি। ভারতে সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য ফি মিলিয়ে সম্পত্তির মূল্যের ৭-১০% খরচ হয় এবং

ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে সম্পত্তির মূল্যের ৫-৭% স্ট্যাম্প ফি এবং ১% নিবন্ধন ফি হিসেবে নেওয়া হয়।[৩০]অপর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য ফি বাবদ সম্পত্তির মূল্যের ওপর শ্রীলংকায় ৫.১%, ভারতে ৭.২% দিতে হয়।[৩১] অপরদিকে, বাংলাদেশেভূমি দলিল নিবন্ধনের জন্য মোট ৯-১২% পর্যন্ত ব্যয় হয়।

নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪: নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪ এর অষ্টম অধ্যায়ের ৪২ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে যে,"নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাদের নিকট আনীত দলিলের বৈধতার সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় এবং যদি দেখা যায় যে দলিল সম্পাদনকারী এমন কোনো সম্পত্তি লেনদেন করছেন যা তার স্বত্বাধীন নয় বা দলিলটি কোনো তৃতীয় পক্ষের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে যারা এই লেনদেনের সাথে জড়িত নয় বা বিষয়টি প্রতারণামূলক বা সরকারি নীতির পরিপন্থী বা দলিলটি পূর্বেও তারিখযুক্ত বা দলিলটির নিবন্ধন শান্তি ভঙ্গের কারণ ঘটাবে এমন সব কারণে দলিল নিবন্ধনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তার অনুচিত হবে। যেহেতু এসকল এবং অনুরূপ বিষয়াদির ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তের আবশ্যক হয় তাই এসকল ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কিছুই করার নেই। যদি দলিলটি সঠিকভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সঠিক কার্যালয়ে আইন অনুমোদিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয় এবং নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, কথিত সম্পাদনকারীই সেই ব্যক্তি যার প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন এবং যদি উক্ত ব্যক্তি সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করে দলিলটি নিবন্ধন করতে বাধ্য থাকবেন।" অর্থাৎ এই বিধান অনুযায়ী মালিকানা না থাকলে, অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, বিষয়টি প্রতারণামূলক বা সরকারি নীতির পরিপন্থী হলেও সাব-রেজিস্ট্রার এরূপ দলিল নিবন্ধন করতে বাধ্য হন। এর ফলে অন্য পক্ষের ক্ষতির আশংকা থাকে।

এছাড়া নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪ এর ১৩ অধ্যায়ে উল্লেখিত আমমোক্তারনামা বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিষয়ক বিধিতে কিছু সংশোধন প্রয়োজন। কারণ, ওয়ারিশান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন করতে আসলে তা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া বিদেশ থেকে যারা পাওয়ার অব অ্যাটর্নির পত্র পাঠান সেটা নির্ধারিত ফরমেটে পাঠান না। ফলে উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন করতে সমস্যা হয় এবং সময় বেশি লাগে। এছাড়া এওয়াজ-বদল ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে উৎস কর কে দেবে সেটা আইনে স্পষ্ট নয়। এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বর্তমানে এটা গ্রহীতার কাছ থেকে নেওয়া হয়। এছাড়া ভ্রম সংশোধন দলিলের ক্ষেত্রেও জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোনো কারণে যদি ২/৩টি ভুল হয়ে যায়, তা যতই ছোট হোক, পুরো ফি দিয়ে আবার নিবন্ধন করতে হয়। এতে করে সেবাগ্রহীতাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ থাকে।

> "...এখানকার মৌজা রেটের কারণে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজকে একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করব ১০ লক্ষ টাকা যেটার প্রকৃত মূল্য কিন্তু মৌজা রেইট অনুযায়ী ১৫ লক্ষ টাকার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।"- একজন তথ্যদাতা

সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজার মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা ২০১০: এ বিধিমালার ৩ নং বিধিতে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির বাজার মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে এবং ৩ নং বিধিতে এই মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৩ নং বিধির ৩ নং উপ-বিধিতে বলা হয়েছে ব্যক্তি মালিকাধীন সম্পত্তির বাজার মূল্য একটি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এসকল বিধান অনুযায়ী দলিল নিবন্ধনের জন্য সম্পত্তির একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য হয়ে থাকে। মূলত সম্পত্তির কম মূল্য দেখিয়ে ও জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে নিবন্ধন করার প্রবণতা রোধ করার জন্য সরকার থেকে জমির প্রকৃতি অনুসারে একটি এলাকার বিভিন্ন মৌজার জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। একে প্রচলিতভাবে গড় মৌজা মূল্যও বলা হয়। আইনে প্রতি বছর সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। এক বছরে একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত সাফ-কবলা দলিলসমূহের মূল্যের ওপর সংশ্লিষ্ট মৌজার শ্রেণিভিত্তিক গড় মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তবে এটি প্রস্তুতের সময় উক্ত মৌজার শ্রেণিভিত্তিক গড় মূল্যের তুলনায় অস্বাভাবিক মূল্যের তিনটি দলিল রেজিস্ট্রি হলে তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য অনুসারে এই সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণে কিছু সমস্যা রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এ নির্ধারিত মূল্য সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। দেখা যায় যে কোথাও কোথাও সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্য মৌজার শ্রেণিভিত্তিক গড় মূল্যের থেকে কম, এক্ষেত্রে ক্রেতাকে বেশি টাকা নিবন্ধন ফি দিতে হয় এবং সেবাগ্রহীতার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপরদিকে দেখা যায় যে কোথাও কোথাও সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্য মৌজার শ্রেণিভিত্তিক গড় মূল্যের থেকে অনেক বেশি, এক্ষেত্রে ক্রেতাকে বিক্রয় মূল্যের তুলনায় কম টাকা নিবন্ধন ফি দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে সরকার যথাযথ রাজস্ব পায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একই মৌজার নাল জমি রাস্তার পাশে থাকলে অনেক বেশি দাম হয়, আবার খালের পাশে থাকলে কম দাম হয়। ফলে এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি খালের পাশের জমি ক্রয় করে তাকে বেশি দামে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।

---

[৩০]https://www.bankbazaar.com/home-loan/property-registration-fees-and-stamp-duty-charges.html

[৩১]Expanding Housing Finance to the Underserved in South Asia: Market Review and Forward Agenda, The World Bank, 2010

দেখা যায় যে একটি মৌজায় কয়েকটি দলিল হয়ত সম মূল্যে বা কাছাকাছি মূল্যে নিবন্ধিত হল কিন্তু অপর কিছু দলিল হয়ত অধিক মূল্যে নিবন্ধিত হল এবং এই সকল দলিলের যখন গড় মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন অধিক মূল্যে নিবন্ধিত দলিলের কারণে মৌজার গড় মূল্য বেড়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে এই বৃদ্ধি প্রাপ্ত মৌজার গড় মূল্য দিয়েই অন্যান্যদের দলিল নিবন্ধন করতে হয়, যদিও তাদের জমির প্রকৃত বাজার মূল্য নির্ধারিত গড় মৌজা মূল্যের সমপরিমাণ নয়। আবার দেখা যায় যে রাস্তার পাশের বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকার জমির মূল্য আর নিচু জমি বা পিছনের দিকের জমির বাজার মূল্য এক নয়। ফলে নির্ধারিত গড় মৌজা মূল্যের কারণে যে ব্যক্তি নিচু জমি বা পিছনের দিকের জমি ক্রয় করে তাকে বেশি টাকা দিয়ে দলিল নিবন্ধন করতে হয়। আবার যিনি রাস্তার পাশের বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকার জমি ক্রয় করছেন তিনি হয়ত অনেক বেশি টাকায় জমি ক্রয় করছেন কিন্তু নির্ধারিত গড় মৌজা মূল্যের কারণে তিনি জমির মূল্যের তুলনায় কম মূল্যে দলিল নিবন্ধন করতে পারছেন।

> "কৃষি জমির দাম ৫০ হাজার টাকা শতাংশ। কিন্তু কাগজে কলমে এর মূল্য অনেক বেশি দেখানো হয় যা বাস্তবে অনেক কম। এর ফলে সরকারি মৌজা মূল্য অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে।" - একজন তথ্যদাতা

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাজার মূল্য সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের থেকে কম বা বেশি হয়ে থাকে। সম্পত্তির বাজার মূল্য বেশি হলে ক্রেতাকে সম্পত্তির প্রকৃত ক্রয় মূল্যের থেকে বেশি মূল্য ধরে রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় ফলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- ক্রেতা হয়ত ১ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করেছেন কিন্তু মৌজার বাজার মূল্য নির্ধারিত আছে আড়াই লাখ টাকা। যেহেতু রেজিস্ট্রেশন ফি বাজার মূল্যের সাথে সম্পর্কিত তাই এসকল ক্ষেত্রে ক্রেতাকে বেশি টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে। আবার সম্পত্তির বাজার মূল্য বাস্তব মূল্যের তুলনায় কম হলে ক্রেতা বেশি মূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করে কম ফি দিয়ে নিবন্ধন করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়। এসকল সমস্যার কারণে বিগত দুই বছর যাবৎ সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ স্থগিত রয়েছে।

অন্যান্য: এ গবেষণায় আরো দেখা যায় যে আইনে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নকলনবীশ নিয়োগ বা তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা বিধিবদ্ধ নেই। তবে ২০১৮ সালে তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধের জন্য একটি বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া তথ্যদাতারা জানান যে বর্তমানে কম্পিউটারে টাইপের মাধ্যমে দলিল লেখা হয়। এই দলিলের লেখা আবার বালামে তোলা হয়। বালাম থেকে আবার কপি করে সার্টিফিকেট কপি লেখা হয়। এত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গিয়ে নকলনবীশরা কখনো কখনো ভুল করে ফেলে। ফলে এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা প্রয়োজন।

৪.২ অবকাঠামোগত ঘাটতি

ভবন ও কক্ষ ঘাটতি: এ গবেষণায় দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা বা অপ্রতুলতা রয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভূক্ত জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে নতুন ভবন হলেও কিছু ক্ষেত্রে জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলো পুরোনো বা ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একইভাবে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে সার্বিকভাবে এই অফিস ভবনগুলোর অবস্থা ভাল নয়। এই অফিসগুলোকে পুরোনো বা ভাড়া ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। ভবনগুলো পুরোনো হওয়ায় কাজ চালানোর ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। ভববনগুলোর দেয়ালে ফাটল, প্লাস্টার খসে পড়া, ছাঁদ চুঁইয়ে পানি পড়া ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে।

সাধারণত একটি জেলার সদর উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস উক্ত জেলা রেজিষ্ট্রার অফিস ভবনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। অপরদিকে উক্ত জেলার অন্যান্য সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসগুলো অন্যান্য উপজেলার পুরোনো কোর্ট ভবনে অবস্থিত এবং ভবনগুলোর অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। তাই সদর সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস ব্যতীত অন্যান্য উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসগুলোর ভবনের অবস্থা তুলানামূলভাবে বেশি খারাপ। এই ধরনের ভবনের ৩-৪টি কক্ষে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভবনগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে এর বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা, দেওয়াল ও ছাদে ফাটল এবং স্যাঁতসেঁতে যেখানে প্রচুর মেরামত ও সংস্কার কার্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের মধ্যে ২৭টি অফিসই পুরোনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। এ ভবনগুলোতে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ভবনগুলোর অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে অনেক সময় ছাদ থেকে পলেস্তারা খুলে পড়ে, বৃষ্টির পানি কক্ষে ঢুকে পড়ে। অন্যদিকে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের বর্তমান কার্যক্রম ও লোকবলের তুলনায় কক্ষের অপ্রতুলতা রয়েছে। কক্ষ স্বল্পতার কারণে একটি অপরিসর কক্ষে ৫-৬ জন বসে কাজ করতে হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে সাব-রেজিস্ট্রারের এজলাস হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিও অনেক ক্ষেত্রে অপরিসর এবং আলো বাতাস চলাচলের অনুপযোগী ফলে গরমের সময় এবং ভীড়ের কারণে রেজিস্ট্রেশন কার্য পরিচালনা কঠিন হয়ে পরে। আবার এ গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে নতুন (যেমন- ২০১২ সালে তৈরী ভবন) ভবনেরও দেওয়ালে ফাটল, প্লাস্টার খুলে পড়া, ছাদ স্যাঁতস্যাঁতে বা ছাদ দিয়ে পানি পড়ে এমন সমস্যা রয়েছে।

তথ্যদারা আরো জানিয়েছেন যে অস্থায়ী মোহরার বা নকলনবীশদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে ভবনের ভিতরে কক্ষে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে তাদেরকে বারান্দায়, ছাদে, সিড়ির নিচে বসে কাজ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কক্ষ সংকটের বা স্থানাভাবে একটি রুমের মধ্যে ২০-২৫ জনকেও কাজ করে। আবার নতুন নকলনবীশ কাজে যোগদান করলে তাদের বসার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ঢাকার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স ব্যতীত আর কোনো সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সেবাপ্রার্থীদের বসার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু অফিসে সেবাগ্রহীতাদের জন্য দু একটি বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হলেও তা প্রয়োজনর তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে অধিকাংশ বিচারপ্রার্থীকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গণেই বিভিন্ন স্থানে (আদালতের বারান্দা, খোলা মাঠ, গাছের তলায়, হোটেল, দোকান, দলিল লেখকদের বসার স্থানে ইত্যাদি) অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া অফিসগুলোতে সেবাপ্রার্থীদের জন্য শৌচাগারের অপ্রতুলতা রয়েছে এবং বিদ্যমানগুলোর অবস্থাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এছাড়া নারীদের জন্য পৃথক কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা কোথাও দেখা যায়নি। অন্যদিকে অনেক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস দোতলায় অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রতিবন্ধীদের উপরে ওঠার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

তবে নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৮টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন এবং ২৩৩টি সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস ভবন নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া ৩০৯ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যায়ে ৪তলা বিশিষ্ট ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন এবং ২-৩ তলা বিশিষ্ট ৯৮টি সাব-রেজিষ্ট্রার ভবন নির্মান প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।[৩২]

অন্যদিকে অনেক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গনে দলিল লেখকদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা রয়েছে। কয়েকটি এলাকায় দেখা গেছে যে,দলিল লেখক সমিতির ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাদেরকে অফিস প্রাঙ্গণে ছাপড়ার নিচে বসে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়। এছাড়া কিছু এলাকায় দলিল লেখকদের বসার স্থান সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে অনেক দূরে অবিস্থিত হওয়ায় দলিল লেখকদের কাজ করতে অসুবিধা হয়।

রেকর্ডরুম সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা:মূলত একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে উক্ত অফিসে সম্পাদিত দলিলের রেকর্ড ওই অফিসের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর এই রেকর্ডসমূহ জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের রেকর্ডরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে একটি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসে উক্ত জেলার আওতাধীন সকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে আগত দলিলের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে কিছু এলাকার জেলা রেকর্ডরুমে অনেক বছর (প্রায় দেড়শ বছর পুরোনো , ১৮৩৪ থেকে) আগের দলিল সংরক্ষিত রয়েছে। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের রেকর্ডরুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তথ্যদাতারা জারিয়েছেন যে বছরে যে পরিমাণ দলিল রেজিস্ট্রেশন হয়, যে পরিমাণ দলিল এবং পুরোনো দলিল এই রেকর্ডরুম গুলোতে সংরক্ষিত থাকে সে অনুপাতে রেকর্ডরুমের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। রেকর্ডরুমগুলো পুরোনো, ছোট বা অপরিসর। রেকর্ডরুমে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রাখার স্থানের ঘাটতি রয়েছে। ভবন পুরোনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং সেগুলোতে পোকা-মাকড়ের (উইপোকা) উপদ্রব রয়েছে। অনেক সময় রেকর্ড রুমের মধ্যে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ে। ফলে আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে জেলা রেকর্ডরুমের অবস্থাও সন্তোষজনক নয় । রেকর্ডরুম একেবারেই জরাজীর্ণ। যত্রতত্র সূচি এবং বালামের ছোট ছোট টুকরো পড়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে সুচী বইয়ের প্রায় ২৫ শতাংশ ক্ষয়ে গেছে। পুরোনো কাগজ উল্টাতে গেলেই ভেঙ্গে পড়ে।

৪.৩ লজিস্টিকস ঘাটতি

> "...প্রয়োজনের তুলনায় কম আলমারি থাকায় পুরনো দলিল সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে পুরোনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে।"- একজন কর্মকর্তা

জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর অবকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও (আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফরম, বিভিন্ন ধরনের রেজিষ্টার, ইনডেক্স, রেকর্ডরুমের জন্য কেরোসিন, ন্যাপথলিন ও যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার আওতাভূক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩২টিতেই এমন চিত্র দেখা যায়। দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান আসবাবপত্রের অবস্থা জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপোযোগী। প্রয়োজনীয় আলমারি না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও বালামসমূহ অফিসের বিভিন্ন স্থানে (আলমারির ওপরে, মেঝেতে ইত্যাদি স্থানে) খোলা অবস্থায় রাখা হয়। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের আসবাবপত্র বিশেষ করে টেবিল চেয়ার স্বল্পতার কারণে নকলনবীশদের নিজেদেরই চেয়ার, টেবিল ক্রয় করে নিয়ে এসে কাজ করতে হয়।

[৩২] 'সুবিধা বাড়াতে নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হলো' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জানুয়ারি ২০১৮

এছাড়া অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসেই বালাম বা বুক ভলিউমের স্বল্পতা রয়েছে যা অন্যতম প্রধান লজিস্টিক সংকট হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, অনেক সময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী বালাম বই এর সরবরাহ থাকে না। আবার অনেক সময় বড় অফিস হলে বা বেশি দলিল রেজিস্ট্রেশন হলে বালাম দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বালাম বই না থাকার ফলে নকলনবীশরা মূল দলিল থেকে কপি করে বালাম লিখতে পারে না ফলে প্রচুর দলিল বালামে তোলার কাজ বাকি থাকে। বালাম বই পর্যাপ্ত থাকলে প্রত্যেক নকলনবীশ একটি করে বালাম বইয়ের কাজ পায়, বালাম বইয়ের সংকট থাকলে ১টি বালাম বইয়ে ৪/৫ জন নকলনবীশ কাজ করে। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, সম্প্রতি যে বালাম বই সরবরাহ করা হয়েছে এগুলোর কাগজ খুবই নিম্নমানের। লিখতে গেলে কালি কাগজে পুরো শুষে নেয়। ফলে এ কাগজে তোলা দলিলের কপি সংরক্ষণে সমস্যা হচ্ছে।

> "...বালাম বইয়ের সরবরাহ ছিল না দীর্ঘদিন। ২ বছর বালামে দলিল উঠে নাই। এখন ২০১৩ সালের দলিলের কাজ করতে হচ্ছে। প্রায় ৭০ হাজার দলিল পেন্ডিং। তবে আশা করছি নকলনবীশ যারা নতুন এসেছে তাদের বালাম দিলে দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যাবে।"- একজন কর্মকর্তা

গবেষণার আওতাভুক্ত প্রায় সব সাব-রেজিস্ট্রার অফিসেই পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, নকলনবীশরা কয়েক বছর আগের দলিলগুলো বালাম বই এ তুলছে। যেমন-২০১৮ সালে তারা ২০১৩ বা ২০১৫ সালের দলিলের নকল বালামে তুলছে। অনেক কাজ পেন্ডিং হয়ে যাওয়ার ফলে সেবাগ্রহীতাদের দলিল পেতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন বালাম না থাকার কারণে নকলনবীশরা কাজ করতে পারে না। ফলে তাদের পারিশ্রমিক তারা সে সময় পায় না। গবেষণাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ১৮টি অফিসে বালাম বইয়ের স্বল্পতা বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। একইভাবে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নানা ধরনের ইনডেক্স রেজিস্ট্রার ও রশিদ বইয়ের ঘাটতি রয়েছে। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অনেক ধরনের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হয়। ৪-৫ ধরনের পে অর্ডার করতে হয় এবং প্রতিটির জন্য আলাদা রেজিস্টার আছে। প্রয়োজন অনুযায়ী রেজিস্টারের যোগান সবসময় থাকে না। এছাড়া ৪২ ধারার কোন দলিল রেজিস্ট্রি হলে তাকে সাথে সাথে রশিদ দিতে হয়। ঐ রশিদ বইটিই অনেক সময় থাকেনা। তখন সাদা কাগজেই স্লিপ দেওয়া হয় যেখানে, এই রশিদটি দিয়েই সে দলিল উত্তোলন করবে এটা অত্যন্ত মূল্যবান রশিদ, এটা হারিয়ে গেলে তার অনেক সমস্যা হবে। এগুলোর জন্য কোনো বরাদ্দেরও ব্যবস্থা নেই। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, এগুলো স্থানীয়ভাবে নিজেদেরকে 'ম্যানেজ' করতে হয়। বালাম বইয়ের সংকটের পাশাপাশি দৈনন্দিন অফিস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম, ফাইল ও বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সংকট রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের সরবরাহ থাকে না। আবার কাজও বন্ধ রাখা যায় না ফলে 'ম্যানেজ' করতে হয়। দলিলের নকল সহবরাহ থেকে আদায়কৃত টাকা থেকে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে নকলনবীশরা দলিলের নকল সরবরাহ বাবদ সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে বেশি আদায় (যেমন- প্রতি পৃষ্ঠা ২৪ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা আদায় করা হয়) করে এবং এভাবে এই অফিসের পরিচালনার স্টেশনারি ও অন্যান্য খরচ 'ম্যানেজ' করা হয়।

অন্যদিকে এই অফিসগুলোতে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টারের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া যাতায়াতের জন্য জেলা রেজিস্ট্রারদের জন্য কোনো ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। ফলে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলো পরিদর্শনে যেতে তাদের অসুবিধা হয়।

৪.৪ বাজেট ঘাটতি

নিবন্ধন বিভাগের বাজেট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়। জাতীয় বাজেটে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটে নিবন্ধন অধিদপ্তরসহ দেশের সকল অধস্তন আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (আইন কমিশন, জাটি, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ইত্যাদি) ও আইন ও বিচার বিভাগের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৬ নিবন্ধন অধিদপ্তর ও এর অধীনস্ত জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর জন্য বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড় করে থাকে। এই বাজেট থেকে মন্ত্রণালয় থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে জেলা রেজিস্ট্রার অফিসে প্রেরণ করা হয় এবং জেলা রেজিস্ট্রার অফিস (ক্যাটাগরি অনুযায়ী) তার আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে অর্থ প্রেরণ করে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয়ে চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে আর্থিক চাহিদা প্রেরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১২,৮০,৪৫,০০০ এবং ১২,৫০,৫৬০০০ টাকা। দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের তুলনায় বাজেট কমেছে।

কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, সার্বিকভাবে নিবন্ধন বিভাগের বাজেট ঘাটতি রয়েছে। তাদের মতে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে খুবই স্বল্প পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় যা দিয়ে তাদের দাপ্তরিক ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অফিস বরাদ্দ হিসেবে ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, এই টাকা দিয়ে মাত্র দু'মাসের খরচ মেটানো সম্ভব। এছাড়া কোনো কন্টিজেন্সি বাজেট নাই। তারা আরো জানান যে, প্রতিবছর শুধু ট্যাক্স কালেকশন (টিসি)

> "..সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। এমনকি টিপসই এর কালিটাও আমাদের কিনতে হয়। বালাম বা অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য কেরোসিন ও পাউডার আমাদের নিজ উদ্যোগে কিনতে হয়"
>
> *- একজন কর্মকর্তা*

সেকশনে ছয়'শ বা সাড়ে ছয়'শ টাকা বরাদ্দ আসে। এর বাইরে কোনো বরাদ্দ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে আসে না। আপ্যায়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রেকর্ডরুমের জন্য কেরসিন, ন্যাপথলিন, কলম, কাগজ, রেজিস্টার খাতা, কার্বন, স্টাম্প প্যাড বাবদ কোনো বরাদ্দ নেই। যেসকল অফিস ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করে সেখানে বাড়ি ভাড়ার টাকা আসে বছরে দুইবার, ফলে অনেক সময় বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকে। মাসে এক হাজার টাকার মতো রেজিস্টার লাগে কিন্তু জেলা রেজিস্ট্রারঅফিস থেকে যে সাপ্লাই আসে তা ৫-৬ মাস চলে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন থেকেও অনেক সময় আর্থিক চাহিদা আসে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। এসকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তাদেরকে অন্যদের সাহায্য নিতেই হয়। একজন সাব-রেজিস্ট্রার বলেন, "সিস্টেমটাই এমন যে আমাদের নিতেই হয়, দলিল লেখকদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হয়। তারা সেবাগ্রহীতাদের থেকে আদায় করে।।"

অন্যদিকে তথ্যদাতারা জানান যে নিবন্ধন কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফি বর্তমান সময়ের সাথে হালনাগাদ করা হয়নি বিধায় অনেক কম। যেমন-কমিশন করতে গেলে একজন সাব-রেজিস্ট্রার প্রতি কিলোমিটারের জন্য ১০ টাকা টিএ ডিএ পায় এবং পিয়ন গেলে ৬ টাকা পায়। এ টাকা দিয়ে বর্তমান সময়ে যাতায়াত ও ভ্রমনের আনুসাঙ্গিক খরচ নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া নকলনবীশরা জানিয়েছেন যে তাদের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকও অত্যন্ত কম। ৩০০ শব্দ বা প্রতি পাতা ভলিউম বা বালাম লেখার জন্য তারা ২৪ টাকা পারিশ্রমিক পান এবং ইংরেজি প্রতি পৃষ্ঠার জন্য পান ৪০ টাকা। এর ফলে নকলনবীশ ও দলিল লেখকরা তাদের নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায় করেন। নকলনবীশরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে সরকারি ফি বাদে তারা দলিলের নকলের জন্য ৩০০/৪০০ টাকা বেশি নিয়ে থাকেন। এছাড়া আর্থিক ঘাটতি থাকার কারণে অনেক সময় নকলনবীশদের নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয় না। তবে এ সমস্যা নিরসণে এখন একটি পৃথক ব্যাংক একাউন্ট খুলে সেখানে নকলনবীশদের পারিশ্রমিকের টাকা পাঠানো হচ্ছে। একইভাবে দলিল লেখকদের পারিশ্রমিকও সময়োপযোগী নয় বলে দলিল লেখকরা জানিয়েছেন।

৪.৫ ভূমি নিবন্ধন সেবায় ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি

এ গবেষণায় দেখা যায় যে নিবন্ধন সেবায় এখনও ডিজিটাইজেশন হয়নি। ভূমি নিবন্ধন সেবা সংক্রান্ত কোনো ডাটাবেজ নেই। এর ফলে এ সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে পাওয়া ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, ক্ষেত্রবিশেষে জাল দলিল সহজে চিহ্নিত করা যায় না এবং নিবন্ধনের পর মূল দলিল ও দলিলের নকল উত্তোলনে সেবাগ্রহীতারা দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়।

প্রায় সকল তথ্যদাতারাই নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন তথা ডিজিটাইজেশন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তথ্যদাতারা বলেন যে নিবন্ধন সেবাকে আরো সহজতর, সময়াবদ্ধ এবং টেকসই করার জন্য ডিজিটাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে বিদ্যমান নানা চ্যালেঞ্জ ও সেবাগ্রহীতাদের নানা হয়রানি দূর করা সম্ভব বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া চলছে এবং দু'একটি অফিসে পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তবে এগুলোর অগ্রগতি অত্যন্ত কম। তথ্যদাতারা জানান যে রেজিস্ট্রেশন অফিসের গুরুত্বপূর্ন রেকর্ড সংরক্ষণ ডিজিটালি করা হলে ডকুমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, সহজে কোনো রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে। এছাড়া ফি এর টাকা অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা হলে নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো সহজ ও দ্রুত হয়ে যাবে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যদি অনলাইনে যাচাই করার ব্যবস্থা থাকলে নিবন্ধনে নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধ করা সম্ভব হবে।

৪.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

সাব রেজিস্ট্রার পদে জনবল ঘাটতি: এ গবেষণায় দেখা গেছে যে সার্বিকভাবে সারা দেশের সাব-রেজিস্ট্রির অফিসগুলোতে বিভিন্ন পদে জনবল ঘাটতি রয়েছে। দেশের সাব-রেজিস্ট্রির অফিসগুলোতে বিপুল সংখ্যক দলিল নিবন্ধনের যে চাপ তা পরিচালনার জন্য স্থায়ী জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রির অফিসগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রারের পদ ফাঁকা রয়েছে এবং ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রির অফিসের মধ্যে ২২টিতে পূর্ণকালীন সাব-রেজিস্ট্রারের ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়ে গেছেন, দীর্ঘ ছুটিতে আছেন, প্রশিক্ষণের আছেন, চাকুরী ছেড়ে গেছেন কিংবা অবসর গ্রহণের কারণে চলে গেছেন কিন্তু উক্ত পদগুলোতে সাথে সাথে নতুন সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন না করায় পদগুলো সাময়িকভাবে শূন্য রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে উক্ত অফিসগুলোতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে একাধিক (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটি) সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্য সম্পাদন করতে হয়। নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা

> "...আমি মূলত এখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাজ করছি। আমার কর্মস্থল এখানে না। আবার আমাকে অন্য এক উপজেলাতেও কাজ করতে হয়। তার মানে আমি সপ্তাহে তিনটি অফিসে সার্ভিস দেই। সাব রেজিস্টার পদ খালি হওয়ার কারণে দৈনন্দিন রেজিস্ট্রেশনের কাজ বন্ধ থাকে।"-একজন সাব-রেজিস্ট্রার

অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার সপ্তাহে এক বা দুই দিন তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার অফিসে অফিস করেন এবং শুধু ঐ দিনগুলোতে উক্ত অফিস দলিল রেজিস্ট্রেনের কাজ হয়, সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয় না। এছাড়া সপ্তাহে এক বা দুই দিন অন্য অফিসে কাজ করার ফলে তার নিজের অফিসেও উক্ত দিনগুলোতে নিবন্ধনের কাজ ব্যাহত হয়। এর ফলশ্রুতিতে উক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে রেজিস্ট্রেশনের কাজে বিলম্ব ঘটে, সেবাগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আবার যে এক বা দুই দিন রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয় সে দিনগুলোতে অফিসগুলোতে বেশি কাজের চাপ এবং ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

কর্মচারী পদে জনবল ঘাটতি: অপরদিকে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে জনবলের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সাব-রেজিস্ট্রারসহ স্থায়ী কর্মী সংখ্যা হচ্ছে পাঁচজন (একজন সাব-রেজিস্ট্রার; একজন অফিস সহকারী; দুইজন মোহরার; একজন টি.সি. মোহরার)। এছাড়া, অস্থায়ী কর্মী হিসেবে পিওন, উমেদার এবং নকলনবীশরা কাজ করে। এছাড়া দলিল খোঁজার জন্য তল্লাশীকারক রয়েছে। নকলনবীশদের মধ্যে থেকে কিছু ব্যক্তি তল্লাশীকারক হিসেবে রেকর্ডরুমে কাজ করে। এছাড়া ২ জন নৈশ প্রহরী ও ২ জন ক্লিনার রয়েছে। এদের প্রতিদিন ৬০ টাকা হিসেবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে পাঁচজন স্থায়ী কর্মী দিয়ে বর্তমান সময়ে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করা অনেক কঠিন হয়ে পরে। এছাড়া যেসকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অনেক বেশি সংখ্যক দলিল নিবন্ধন হয় এবং যেসকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অনেক কম সংখ্যক দলিল নিবন্ধন হয় উভয় ক্ষেত্রেই একই জনবলের বরাদ্দ দেওয়া রয়েছে। তথ্যদাতাদের মধ্যে ছোট অফিসে বর্তমানের জনবল দিয়ে ছোট অফিস চালানো গেলেও বেশি সংখ্যক দলিল নিবন্ধন হয় যে অফিসে সেখানে কাজ সম্পন্ন করা অনেক কঠিন হয়ে পরে। এছাড়া কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নেই। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেকর্ডকিপারের কোন পদ নেই। আবার অনেক অফিসে দলিলের তুলনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নকলনবীশ নেই। আবার অনেক সময় দুর্নীতি দমন কমিশন, আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চাওয়া হয় কিন্তু পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তৎক্ষণাৎ সেগুলো কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। আবার তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য সেটেলমেন্ট অফিস ও এসিল্যান্ড অফিসেও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি যেমন- প্রয়োজনীয় জনবল ও যানবাহন না থাকার কারণে তারা সেটা পারে না।

> "নকলনবিশ নিয়োগ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল তাই অনেক দলিল বালাম বইয়ে লেখা হয়নি বা রেকর্ড হয়নি। ব্যাক লগ কাজ যে পরিমাণ আছে তাতে সেটা করতে কমপক্ষে ২০ বছর লাগবে।"- একজন তথ্যদাতা

সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধন সংক্রান্ত অধিক কাজের চাপের তুলনায় বিদ্যমান অনুমোদিত জনবল অত্যন্ত অপ্রতুল এবং অনেক সময় নকলনবীশদের দিয়ে অফিসের কাজ (ইনডেক্সিং, সার্চিং ইত্যাদি) করানোয় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি বা দলিলে অভিগম্যতা পায় যা ঝুঁকিপূর্ণ। কাজের চাপের কারণে নিবন্ধন সম্পন্ন হতে দেরী হয়, দলিল লেখকরা দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার কথা বলে সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, বালাম লেখার কাজ পেন্ডিং থাকে, সেবাগ্রহীতাদের নিবন্ধিত মূল দলিল পেতে অনেক দেরী হয়।

> "দৈনন্দিন কাজের চাপের তুলনায় জনবলের অভাব রয়েছে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। অধিকাংশ সময় নকলনবীশদের সহযোগিতা নিতে হয়।"- একজন সাব-রেজিস্ট্রার

নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে সার্বিকভাবে বেশ কিছু পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তর হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির জন্য নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এটি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। অপরদিকে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলিল লেখক সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি: যথাযথ সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কর্মচারীদের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তথ্যদাতারা জানান যে সাব-রেজিষ্ট্রারদেরকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিপিএটিসিতে দু'মাসের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং হয়। এছাড়া যোগদানের সময় নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং একজন সিনিয়র সাব রেজিস্টারের অধিনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিদেশেও প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়।তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে এবং সকলে সমান সুযোগ পায় না।

অন্যদিকে দেখা যায় যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত নকলনবীশ এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত দলিল লেখকদের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে কাজ শেখে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের জানায় ঘাটতি থাকে এবং কাজে ভুল হয় যার জন্য সেবাগ্রহীতারা

অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- দলিলে লেখকের ভুলের কারণে দলিলে কোনো ত্রুটি থেকে গেলে তা সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত সংশোধনী ফিস প্রদান করতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৫.১ ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতার ঘাটতি

সরকারি কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একুশ শতকে উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে তথ্য। তথ্য জানা নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার[৩৩]। জনগণের জন্য বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন চালুসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরই ধারাহিকতায় নিবন্ধন অধিদপ্তর দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে আছে জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল নিবন্ধন সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত তথ্যবোর্ড ও নাগরিক সনদ টানানো, অভিযোগ বাক্স স্থাপন ইত্যাদি। গবেষণাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ, জেলা রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিবন্ধন অধিদপ্তরের তথ্যের উন্মুক্ততার চিত্র ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

নাগরিক সনদ সংক্রান্ত: এই গবেষণার আওতাধীন ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩১ অফিসে নাগরিক সনদ বা নাগরিক আছে। কিন্তু দেখা গেছে নাগরিক সনদ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে রাখা হয়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে তথ্য হালনাগাদ নয়, লেখা অস্পষ্ট ও ছোট। যে ৩১টি অফিসে নাগরিক সনদ আছে তার মধ্যে ২৮টি অফিসে নাগরিক সনদ অফিস প্রাঙ্গনে টানানো আছে যা সেবাগ্রহীতাদের কাছে দৃশ্যমান। বাকি তিনটি অফিসে নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। এছাড়া ১৩টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের নাগরিক সনদ হালনাগাদ নয় এবং নয়টি সাব-রেজিস্ট্রির অফিসের নাগরিক সনদে বিভিন্ন দলিল নিবন্ধনের ফি ও নথিপত্র উত্তোলনের ফি'র উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, ৩১টি অফিসের মধ্যে অধিকাংশ অফিসের নাগরিক সনদে দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেবার আংশিক তথ্যের উল্লেখ আছে। বিশেষ করে দলিল নিবন্ধন, নথিপত্র তল্লাশি বা দলিল নিবন্ধনের জন্য সরকার নির্ধারিত ফি, নকলনবীশগন ও দলিল লেখকদের বিভিন্ন কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ, সেবার ধরনভেদে সেবা প্রদানের সময়সীমার উল্লেখ নেই। অন্যদিকে কোনো কোনো সাব-রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে নাগরিক সনদ তৈরি করেছেন এবং এর জন্য তারা নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে কোনো আর্থিক বরাদ্দ পাননি। তবে এ গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অফিসে নাগরিক সনদ থাকলেও সেবাগ্রহীতারা খুব কম ক্ষেত্রেই এর সুফল পাচ্ছেন।

> "নাগরিক সনদ কার্যকর। তবে এটা জনগণের জন্য আরো সহজবোধ্য করতে হবে। যেমন ধরুন, বিভিন্ন ফি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া আছে। এটা এককভাবে সহজে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সেটা চিন্তা করতে হবে"।- একজন তথ্যদাতা

তথ্যবোর্ড সংক্রান্ত: নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিতে প্রতিটি নিবন্ধন কার্যালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞপ্তি যেমন- ফিসের তালিকা[৩৪], দলিল দাখিলের সময়সূচি[৩৫], দৈনিক সমাপ্তকৃত দলিলের দৈনিক বিজ্ঞপ্তি[৩৬], পাওয়ার অব অ্যাটর্নী প্রত্যাহার সংক্রান্ত নির্দেশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, প্রত্যাহৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নীর তালিকা, নাগরিক সনদ, তল্লাশি ও নকলের আবেদন গ্রহণের সময়সূচী, রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত দূরত্ব তালিকা[৩৭], জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ অফিসে এর সবগুলো বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শিত নেই।

> "১০০টি দলিল হলে ১০ জন দলিল নিবন্ধনের আগে তথ্যের জন্য আসে। তথ্যবোর্ডের তথ্য সাধারণ জনগণ দেখে না। এটা সরকারি নিয়ম তাই আমরা দিয়ে থাকি। এটা খুব একটা কার্যকর না।"- একজন তথ্যদাতা

[৩৩] তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪
[৩৪] নিবন্ধন আইন ১৯০৮, ধারা ৭৯
[৩৫] নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪, বিধি ১১৩
[৩৬] নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪, বিধি ১১৪
[৩৭] মহা-পরিদর্শক নিবন্ধন কর্তৃক প্রচারিত বিভাগীয় উপদেশ ও আদেশাবলি, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ১৯৫

গবেষণাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩৩টি অফিসে তথ্যবোর্ড আছে। এর মধ্যে ৩০টি অফিসে তথ্যবোর্ড সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগোচর স্থানে টানানো আছে। বাকি তিনটি অফিসে তথ্যবোর্ড সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত নয়। ছয়টি অফিসের তথ্যবোর্ডে বিভিন্ন দলিল নিবন্ধনের ও নথিপত্র উত্তোলনের ফি'র উল্লেখ নেই। এছাড়া ৩৩টি অফিসের মধ্যে ২৭টি অফিসের তথ্যবোর্ডে তথ্য কর্মকর্তার নাম ও তার সাথে যোগাযোগের জন্য কোনো ফোন কিংবা মোবাইল নম্বরের উল্লেখ নেই। কিছু কিছু সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে তথ্যবোর্ড অফিস কক্ষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যবোর্ডের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় তা নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের কোনো উপকারে আসছে না।

গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অধিকাংশ সেবাগ্রহীতা তথ্যবোর্ডে নিবন্ধন সেবা বা নথিপত্র উত্তোলন সংক্রান্ত তথ্য পড়ে দেখেন না। এর কারন হিসেবে তারা জানিয়েছেন, এ ধরনের কাজে তারা মূলত স্থানীয় দলিল লেখকদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং দলিল লেখকদের সাথে কাজে ধরন ভেদে নির্দিষ্ট আর্থিক প্যাকেজ নির্ধারণের মাধ্যমে তারা কাজ করেন। উল্লেখ্য, তথ্যবোর্ডে কাজের ধরনভেদে যে ফি'র উল্লেখ আছে সে অনুযায়ী কাজ হয় না অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের ফি'র অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে সেবা গ্রহণ করতে হয়।

দলিল লেখকদের তালিকা ও ফি সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা: দলিল লেখক সনদ বিধিমালা ২০১৪ এর ৬ বিধিতে বলা হয়েছে যে সনদ প্রাপ্ত দলিল লেখকদের তালিকা নিবন্ধন কার্যালয়ের কোনো প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু গবেষণার আওতাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলো পরিদর্শনে এ ধরণের কোনো তালিকা প্রদর্শিত হতে দেখা যায়নি। একইভাবে এই বিধিমালার ৯ ও ১০(১) বিধিতে বলা হয়েছে যে দলিল লেখকদের ফিসের হার বা তালিকা মহা-পরিদর্শক নিবন্ধন দ্বারা নির্ধারিত হবে, গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে এবং ফিসের তালিকা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের বাইরে কোনো দৃষ্টিগোচর স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু গবেষণার আওতাভূক্ত অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর প্রাঙ্গণে বা কার্যালয়ের বাইরে এমন কোনো ফিসের তালিকা কোনো দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত হতে দেখা যায়নি।

তথ্যকেন্দ্র সংক্রান্ত: গবেষণার আওতাধীন ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কোনেটিতেই পৃথক কোনো তথ্য অনুসন্ধান ডেস্ক পরিলক্ষিত হয়নি। গবেষণাভুক্ত সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা সংক্রান্ত: অনেক ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম প্রদর্শিত নেই। অন্যদিকে সাব-রেজিস্ট্রারদের একাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার বিষয়ে সচেতন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদাধিকার বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাব-রেজিস্ট্রাররা সেবাগ্রহীতাদের তথ্য প্রদান করে থাকেন। সাব-রেজিস্ট্রারদের অনুপস্থিতিতে সাধারণত এ দায়িত্ব পালন করেন অফিস সহকারীরা।

তথ্য ব্যবস্থাপনা: গবেষণাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। বালাম বই, বিভিন্ন রেকর্ড ও নথিপত্রের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া রেকর্ডরুমের দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের সাথে বাইরের দালাল শ্রেণীর (অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলিল লেখক ও নকলনবীশ) যোগসাজশের মাধ্যমে পুরানো দলিলের বা রেকর্ডের পাতা ছিঁড়ে ফেলা বা নষ্ট করার প্রবণতার তথ্য পাওয়া গেছে। এর ফলে সেবাগ্রহীতারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার এবং ক্ষেত্র বিশেষে অফিস সহকারীদের একাংশ জানিয়েছেন সেবাগ্রহীতারা মৌখিকভাবে তথ্য জানতে চায়, তারা লিখিতভাবে বা তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নির্দিষ্ট ফরমেটের মাধ্যমে আবেদন করে না। উল্লেখ্য, গবেষণাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩৫টি অফিস তথ্য প্রদানের জন্য পৃথক কোনো রেজিস্ট্রার ব্যবহার করে না।

ওয়েবসাইট সংক্রান্ত: নিবন্ধন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও তা হালনাগাদ নয়। এই ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতির বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও শুধুমাত্র নিবন্ধন মহাপরিদর্শক-এর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতির কোনো উল্লেখ নেই ওয়েবসাইটে। এছাড়া ওয়েবসাইটটিতে বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রকাশনার বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্ট সেখানে পাওয়া যায়নি[৩৮]।

বার্ষিক প্রতিবেদন: নিবন্ধন অধিদপ্তরের বিস্তারিত কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদন নেই - আইন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে নিবন্ধন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে।

[৩৮] http://www.rd.gov.bd/, ৩ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত

৫.২ ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় জবাবদিহিতার ঘাটতি

দলিল নিবন্ধন সেবায় স্বচ্ছতা ও সততার চর্চা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। দলিল নিবন্ধন সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের জবাবদিহিতার পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

> "প্রতি চার মাস পর পর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে অডিট হয়। অন্যদিকে সিএজি অফিস থেকে দুই, তিন বা চার বছর পর পর অডিট হয়। 'সিএজি'র অডিট হয় ওনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী"।-একজন তথ্যদাতা

আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত: সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে। একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা যা জেলা রেজিস্ট্রার করে থাকেন এবং অন্যটি হল মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিএজি) থেকে হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীন নিরীক্ষায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য জেলা রেজিস্ট্রারদের নিবন্ধন মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হয়, আবেদন অনুমোদন হওয়ার পর জেলা রেজিস্ট্রাররা এ ধরনের নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে। এ ধরনের নিরীক্ষা সাধারণত চার থেকে ছয় মাস পর পর হয়ে থাকে। জেলা রেজিস্ট্রাররা নিরীক্ষার সময় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল সম্পাদন অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের বিষয় খতিয়ে দেখেন। এছাড়া জমির গড় মূল্য ঠিক রেখে জমি নিবন্ধন হচ্ছে কিনা এবং জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করে নিবন্ধন হচ্ছে কিনা এসব বিষয়ও নিরীক্ষার সময় যাচাই-বাছাই করা হয়। নিরীক্ষার সময় দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে দলিল পরীক্ষা করা হয়। অন্যদিকে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নিরীক্ষার বিষয়টি অনিয়মিতভাবে হয়ে থাকে।

জেলা সাব-রেজিস্ট্রারদের কার্যক্রম তদারকি সংক্রান্ত: নিবন্ধন অধিদপ্তর জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করে। বিশেষ করে অধিদপ্তরের ছয়জন বিভাগীয় পরিদর্শক জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে দেশে আটটি বিভাগ হলেও এখনও ছয়জন বিভাগীয় পরিদর্শক দিয়েই এই আটটি বিভাগে জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলো পরিদর্শনের কাজ চলছে। এছাড়া এই পরিদর্শনগুলোও খুব নিয়মিতভাবে হয় না। জেলা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তত্ত্বধান করা হয়। জেলা রেজিস্ট্রাররা সাব-রেজিস্ট্রারদের দলিল নিবন্ধন কার্যক্রম বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখেন আর্থিক নিরীক্ষার সময়। এছাড়া তারা এই অফিসে বালাম বই, বিভিন্ন পত্রের ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তবে অভিযোগ আছে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে যেসব অনিয়ম-দুর্নীতি হয় সে বিষয়ে অধিকাংশ জেলা রেজিস্ট্রার জানেন এবং তারাও এ থেকে অনৈতিক আর্থিক সুবিধাগ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে জেলা রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক সাব-রেজিস্ট্রারদের তদারকি কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নিবন্ধন মহাপরিদর্শকের অনুমতি সাপেক্ষে বিভাগীয় পরিদর্শক কর্তৃক জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নিয়মিত পরিবীক্ষণের নিয়ম থাকলেও তা সব সময় হয় না এবং কোনো কোনো অফিস দীর্ঘদিন এ ধরনের কার্যক্রমের বাইরে থাকে।

সহায়ক কর্মচারী ও নকলনবীশদের কার্যক্রম তদারকি সংক্রান্ত: সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারীরা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে জবাবদিহি করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারীরা নিজ জেলার মধ্যে নিয়োগ পান। সাধারণত নকলনবীশ থেকে মোহরার এবং পরবর্তীতে মোহরার থেকে সহকারী পদ পর্যন্ত এরা পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে। সাব-রেজিস্ট্রারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ব্যতিত দেশের যেকোনো স্থানে নিয়োগ পেতে পারেন এবং প্রতি দুই বছর পর পর তাদের বদলি হয়ে থাকে। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এই অফিসের কর্মচারীরা নিজেদেরকে অধিক ক্ষমতায়িত মনে করেন। স্থানীয় দলিল লেখক, নকলনবীশ, দালালদের সাথে এদের ভালো পরিচিতি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এবং এরা যোগসাজশের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে ক্ষেত্রবিশেষে সাব-রেজিস্ট্রারের পক্ষে কর্মচরীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাব-রেজস্ট্রার নিজেও এ ধরনের অনিয়ম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকির বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। নকলনবীশরা তাদের সব ধরনের কাজের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে জবাবদিহি করেন। পূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সাব-রেজিস্ট্রারদের সুপারিশক্রমে জেলা রেজিস্ট্রাা নকলনবীশদের নিয়োগ করলেও এখন তা সরাসরি নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে হয়ে থাকে। অভিযোগ আছে রাজনৈতিক প্রভাব ও অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নকলনবীশরা নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে নিয়োগ পান। এ গবেষণায় দেখা যায় যে নকলনবীশদের কার্যক্রমও যথাযথভাবে তদারকির ঘাটতি রয়েছে এবং তারাও নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সার্বিকভাবে জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারী এবং নকলনবীশদের কার্যক্রম ও আচরণ যথাযথভাবে তদারকি না হওয়ায় এবং এদের মধ্যে নানা জোগসাজশ থাকায় জবাবদিহিতা কাঠামো যথাযথভাবে কাজ করে না এবং এদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

দলিল লেখকদেও কার্যক্রম তদারকি সংক্রান্ত: দলিল লেখকরা তাদের সব ধরনের কাজের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে জবাবদিহি করেন। সাধারনত একজন ব্যক্তি দলিল লেখকের লাইসেন্স পাওয়ার পূর্বে একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখকে অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেন। এরপর কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তি দলিল লেখকের সুপারিশসহ সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে তার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। এরপর সাব-রেজিস্ট্রার যাচাই-বাছাই করে উক্ত আবেদন জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠান এবং পরবর্তীতে জেলা রেজিস্ট্রার তা নিবন্ধন মহাপরিদর্শক বরাবর পাঠান লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে বিবেচনার জন্য। নিবন্ধন মহাপরিদর্শক চূড়ান্তভাবে লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদবির এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে দলিল লেখকরা লাইসেন্স নিয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে তাদের কাজের অভিজ্ঞতারও ঘাটতি থাকে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে দলিল লেখক সমিতি দলিল লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ গবেষণায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি, জাল দলিল তৈরিসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে । আইন অনুযায়ী কোনো দলিল লেখক নির্ধারিত হারের অধিক 'ফি' দাবি করলে তার সনদ বাতিলযোগ্য হবে - কিন্তু বাস্তবে আনেক ক্ষেত্রেই দলিল লেখকরা তাদের নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায় করলেও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।তথ্যদাতারা জানান যে রাজনৈতিক যোগাযোগ, দলিল লেখক সমিতি এবং দলিল লেখকরা স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার কারণে তাদের জবাবদিহি করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দৈনন্দিন কাজের জন্য লজিস্টিকসের বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় এই অফিস ক্ষেত্রবিশেষে লজিস্টিকস সহয়তার জন্য দলিল লেখক সমিতির ওপর নির্ভনশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে দলিল লেখকরা দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়ম-বহির্ভূত কাজে জড়িয়ে পড়লে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সাব-রেজিস্ট্রারদের কঠিন হয়ে পড়ে।

> দলিল লেখকরা স্থানীয় লোক। তদুপরি তারা সংগঠিত। তাদের একটা সমিতি আছে। আবার এদের মধ্যে বর্তমানে সিংহভাগ রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত। ফলে এরা বেশ শক্তিশালী। চাইলেই এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে নেওয়া যায় না। আবার এদের বিরুদ্ধে কেউ লিখিত অভিযোগ নিয়েও আসে না। তবে কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।-একজন তথ্যদাতা

সার্বিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধনে আর্থিক দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসাজশ থাকায় সার্বিকভাবে জবাবদিহিতা কাঠামো কাজ করে না।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত: যথাযথ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গবেষণাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ২৪টি অফিসে অভিযোগ বাক্স পরিলক্ষিত হয়নি। এর পাশাপাশি গবেষণাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩৮টি অফিসে অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের নম্বর পরিলক্ষিত হয়নি। দলিল নিবন্ধন বা নথিপত্র তল্লাশীর মত সেবা সম্পূর্ণভাবে নকলনবীশ, দলিল লেখক ও দালাল নির্ভর হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা সরাসরি সাব-রেজিস্ট্রারদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পান না। এর ফলে দলিল নিবন্ধন সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কোনো কোনো সাব-রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, সেবাগ্রহীতারা মৌখিকভাবে দলিল লেখক ও নকলনবীশদের বিরুদ্ধে কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করলেও সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তারা তাৎক্ষনিকভাবে তা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন লিখিত অভিযোগের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা এর জন্য পৃথক রেজিস্টার ব্যবহার করেন না।

অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি/অফিস সময় মেনে চলা সংক্রান্ত: নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সকল ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস শুরুর ও শেষ হওয়ার সময় মেনে চলেন না। অফিস পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে নিবন্ধন অধিদপ্তরের, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ দেরী করে অফিসে আসেন এবং প্রায়শই দেরী করে অফিসের কাজ শেষ করেন। অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধনের কাজ দুপুর থেকে শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস রাত পর্যন্ত চলে এবং অভিযোগ আছে এ সময় দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত: নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬ - ২০১৮ সময়কালে ৪৯ জন সাব-রেজিস্ট্রার, ১৯ জন কর্মচারী এবং ৩৬ জন নকলনবীশের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচারণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং এর মধ্যে ৩৮ জন সাব-রেজিস্ট্রার এবং ৩৬ জন নকলনবীশের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ (বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, তদন্ত চলমান, চাকরি থেকে অব্যাহতি) করা হয়েছে। একইভাবে নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬ - ২০১৮ সময়কালে ৯৮ জন দলিল লেখকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে ৪২ জনকে অব্যাহতি প্রদান এবং ৫৬ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলমান রয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনে সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন দলিল নিবন্ধন এবং নথিপত্র উত্তোলন ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ৬১টি অভিযোগ করেছেন। এ অভিযোগগুলো এখনও অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। এর মধে জন সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে ৩৯টি, দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ জমা পড়েছে। বাকি ১৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী, দলিল লেখক সমিতি, নকলনবীশ এবং দালালদের বিরুদ্ধে। সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে জাল দলিল সৃজন, দলিল প্রতি নির্ধারিত পরিমাণে ঘুষ গ্রহণ, অতিরিক্ত ফি গ্রহণ, সময়মত অফিসে না আসা ইত্যাদি। অন্যদিকে দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে সাব-রেজিস্ট্রারের সহয়তায় জাল দলিল সৃজন, দলিল নিবন্ধনের সময় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় ইত্যাদি। এছাড়া দলিল লেখক সমিতি কর্তৃক দলিল প্রতি নির্ধারিত হারে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে চাঁদা আদায়, নকলনবীশ ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন দলিলের নকল সরবরাহ ও নথিপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় ইত্যাদি অভিযোগও জমা পড়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনে[৩৯]।

গণশুনানী সংক্রান্ত: টিআইবি'র একটি গবেষণায় দেখা যায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি নিবন্ধন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ওপর গণশুনানীতে ১০ শতাংশ অভিযোগ জমা পড়েছে[৪০]। এ গবেষণায় দেখা যায় দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর গণশুনানীতে সাব-রেজেস্ট্রার অফিসও অংশগ্রহণ করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যার কার্যকর সমাধান হয় না

> প্রতি মঙ্গলবারে গণশুনানী হয় কিন্তু জনগণ সচেতন না হওয়ায় তারা এই গণশুনানীতে অংশগ্রহন করে না।-একজন তথ্যদাতা

অন্যদিকে কোন কোন সাব-রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন দিনে (সাধারণত মঙ্গলবার) সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গণশুনানী আয়োজন করা হলেও বাস্তবে এসব অফিসে গণশুনানীর নির্ধারিত পদ্ধতি (প্রচার-প্রচারণা, নির্ধারিত স্থান, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয় না। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নির্দিষ্ট দিনের গণশুনানীর বিষয়ে যথাযথ প্রচার-প্রচারণা না থাকায় খুব কম সেবাগ্রহীতা অভিযোগ বা মতামত জানাতে আসেন।

আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত: ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম মূলত ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে[৪১]। এই প্রাতিষ্ঠানিক বিভক্তির ফলে মাঠ পর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ভূমি নিবন্ধন এবং সেই অনুসারে খতিয়ান হালনাগাদের কাজ হওয়ার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা হয় না। জমি নিবন্ধনের পর সেই জমির খতিয়ান হালনাগাদকরণের জন্য ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ (এলটি নোটিশ) এসিল্যান্ড অফিসে পাঠানো এবং সে অনুযায়ী খতিয়ান হালনাগাদের নিয়ম রয়েছে। এ গবেষণায় দেখা গেছে যে রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান দ্রুত এবং নিয়মিত হালনাগাদ হয় না এবং ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে হালনাগাদ রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান সরবরাহ করা হয় না এবং এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা জমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সঠিক মালিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। অপরদিকে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ (এলটি নোটিশ) নিয়মিত এসিল্যান্ড অফিসে পাঠানো হয় না বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে সমন্বয়ের একটি ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

> জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর ও আইন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের অবস্থা ভালো হলেও সব সমস্যা শোনার পরেও তারা (আইজিআর) সমস্যা সমাধানে খুব বেশি উদ্যেগ নেয় না। আইজিআর অফিস সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। দালিল লেখকদের লাইসেন্স, নকলনবিশ নিয়োগ, মোহরার নিয়োগ ও পদন্নোতি ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করে থাকে যেটা ঠিক না। অনেক দায়িত্ব জেলা রেজিষ্ট্রার নিজে অনুমোদন দেওয়ার কথা থাকলেও ঢাকা থেকে (আইজিআর অফিস) হস্তক্ষেপ করে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব তো আছেই।-একজন তথ্যদাতা

[৩৯]দুর্নীতি দমন কমিশন সূত্র

[৪০]ACC's Public Hearing as a Means of Controlling Corruption: Effectiveness, Challenges and Way Forward, Transparency International Bangladesh, 2017, Page-20

[৪১]ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় শুদ্ধাচার চর্চা

৬.১ ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি দলিল নিবন্ধনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাগ্রহীতারা নানা ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৬.১.১ ভূমি দলিল নিবন্ধনে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন:

নিবন্ধন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটির মুখোমুখি তা হচ্ছে আইন দ্বারা নির্ধারিত নিবন্ধন ফি ও আনুসাঙ্গিক বৈধ খরচের বাইরে অনেক বেশি অতিরিক্ত টাকা তাদেরকে এ কাজের জন্য দিতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে টাকা ছাড়া কোনো কাজ করানো অত্যন্ত দূরূহ। দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য সেবাগ্রহীতারা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন বা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে তাদের নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দিতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে আবার"কর্মকর্তাদের দিতে হবে"এমন কথা বলেও তাদের নিকট থেকে টাকা আদায় করা হয়। অর্থাৎ দলিল নিবন্ধনে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে নানা ভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয় এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ নানা ফ্যাক্টর বা বিষয়ের (জমির মূল্য, শ্রেণী, অবস্থান, দলিলের ধরন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা/না থাকা, এলাকা ইত্যাদি)ওপর নির্ভর করে।

ভূমি দলিল রেজিস্ট্রেশনে দালালদের ভূমিকা ও অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ: সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গণে এক শ্রেণীর দালাল টাউটদের[৪২] উপস্থিতি দেখা যায়। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা মূলত জমি কেনাবেচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন- জমির মালিকের সাথে ক্রেতার যোগাযোগ স্থাপন করে দেওয়া ইত্যাদি। দলিল লেখকদের সাথেও এই দালালদের যোগাযোগ থাকে এবং দালল রেজিস্ট্রেশনের কাজের ক্ষেত্রে এরা ক্রেতা-বিক্রেতা বা সেবাগ্রহীতাদের সাথে দলিল লেখকদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এরা মূলত মধ্যস্বত্তভোগী হিসেবে কাজ করে এবং উভয় পক্ষের নিকট থেকেই টাকা নিয়ে থাকে। অনেক সময় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গণে আসা মাত্রই সেবাগ্রহীতারা দালালদের খপ্পরে পড়েন এবং প্রতারিত হন। যেমন-দালাল তাদের আশ্বাস দেন যে নির্ভরযোগ্য দলিল লেখকের সন্ধান দেবেন বা সহজে ও কম খরচে দলিল রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিবে। সেজন্য তারা টাকা পয়সাও নিয়ে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, দালালরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। দালালের খপ্পরে পড়ে বিচারপ্রার্থীদের সময়ক্ষেপণ হয় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে টাউটদের সম্পর্কে[৪৩] বর্ণিত রয়েছে এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গণে তালিকা টানানো এবং দালাল বা টাউটদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর খুব কম প্রয়োগ দৃশ্যমান।

দলিল লেখকদের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ: দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং সেবাগ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম হচ্ছে দলিল লেখক। আইন অনুযায়ী একজন দলিল লেখকই একটি দলিল প্রথমে মুসাবিদা বা খসড়া প্রস্তুত করে এবং পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থাপন করে। তাই একজন ক্রেতা বা সেবাগ্রহীতাকে নিবন্ধন কাজ শুরুর পূর্বেই একজন দলিল লেখকের শরণাপন্ন হতে হয়। তবে দলিল লেখক নির্বাচনের জন্য সেবাগ্রহীতারা তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা যোগাযোগ ব্যবহার করে পরিচিত দলিল লেখক খুঁজে বের করেন এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগে থেকেই দলিল

[৪২] রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, ধারা ২(১১) অনুযায়ী টাউট অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝিবে-যিনি সাধারণত ৮০(জি) ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত রেজিস্ট্রেশন অফিস এলাকায় দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে যুক্ত করার জন্য প্রায়শই যাতায়াত করেন অথবা যিনি ৮০(জি) ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলি মতে টাউটরূপে ঘোষিত হইবার যোগ্য।

[৪৩] রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, ত্রয়োদশ- এ খণ্ড, ধারা ৮০(এ) থেকে ৮০(এফ)

লেখকদের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের ধারণা অত্যন্ত কম থাকে এবং তারা পুরো কাজটার জন্য দলিল লেখকদের ওপর অতি মাত্রায় নির্ভর করে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রাঙ্গণে দলিল লেখকরা সবসময় তাদের মক্কেল বা সেবাগ্রহীতাদের সাথেই থাকে।

সেবাগ্রহীতারা জানিয়েছেন যে, দলিল লেখদেরকে তাদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এ প্রতিবেদনে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আইন অনুযায়ী দলিল লেখকদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা ফি থাকলেও সেটি তারা অনুসরণ করেন না এবং তাদের পারিশ্রমিক ফি'র তালিকা জনসম্মুখে প্রদর্শনের নিয়ম থাকলেও তা করা হয় না। অধিকাংশ সেবাগ্রহীতারাই জানিয়েছেন যে তারা দলিল লেখকদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা ফিস কত সেটিই জানেন না। দলিল লেখার 'ফি' সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের ধারণা না থাকায় অধিকাংশ দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে উচ্চহারে পারিশ্রমিক আদায় করে। আইন অনুযায়ী কোনো দলিল লেখক নির্ধারিত হারের অধিক ফিস দাবি করলে তার সনদ বাতিলযোগ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে দলিল লেখকরা তাদের নির্ধারিত ফি'র অনেক অতিরিক্ত ফি সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে নিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে না। ফলে দলিল লেখকরা সহজেই সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে উচ্চহারে তাদের পারিশ্রমিক আদায়ের সুযোগ পাচ্ছেন। এ গবেষণায় আরো দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে দলিল লেখকরা নিজেরাই জানে না যে তাদের দলিল লেখা বাবদ নির্দিষ্ট ফি নির্ধারিত আছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও তার ব্যয় সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং দলিল লেখকের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে করতে হয় এবং তারা দলিল লেখকদেরকে তাদের নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বাইরে অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হন।

আবার অনেক দলিল লেখকরাও স্বীকার করেছেন যে তারা সেবা গ্রহীতাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেছেন যে তাদের জন্য যে নির্ধারিত পারিশ্রমিক আছে তা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত কম যা দিয়ে তাদের জীবিকা ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া একটি দলিল নিবন্ধন করতে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়। সংশ্লিষ্ট দলিল লেখক সমিতিতে তাদের দলিল প্রতি নির্দিষ্ট হারে টাকা জমা দিতে হয়।

"...আমাদের এখানে সাফ-কবলার সরকারি খরচ প্রতি লাখে ৯০০০ টাকা। আমরা ১২০০০ টাকা নিয়ে থাকি। নোটিশ প্রতি দলিল লেখক সমিতিতে দিতে হয় ৩০০ টাকা। পার্টি বুঝে মাঝে মাঝে বাড়িয়ে নেওয়া হয়। "- একজন দলিল লেখক

" ... আমার জমির পরিমাণ ৬.৬৭ শতাংশ এবং পৌর এলাকার ভেতরে হওয়ায় জমির ক্রয় মূল্য ৭০ লক্ষ টাকা। নিবন্ধন ফি বাবদ টোটাল ব্যাংক ড্রাফট লেগেছে ৭,০০,৬৪০ টাকার। তবে দলিল লেখককে আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য পরিশোধ করি ৭ লক্ষ ৭০ হাজার। দলিল লেখকের মাধ্যমেই কাজ করাই। নিজেদের করার সময় নেই। সত্যিকার অর্থে রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত ধারণার অভাব আছে।......আপনার কাছ থেকে হিসেব শুনে ধারণা করতে পারতেছি আমাদের প্রায় ৬০০০০ টাকার বেশি অতিরিক্ত লেগেছে।"- একজন সেবাগ্রহীতা

সেবাগ্রহীতা তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বিভিন্ন অজুহাতে, বিভিন্ন হিসেবে (যেমন-প্রতি লাখে, থোক বা প্যাকেজে ইত্যাদি) এই অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই টাকার পরিমাণ কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত নেই এবং অনেক সময় এলাকা (অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা সেকল এলাকার জমির দাম বেশি), সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যাটাগরি(ছোট বা বড়), সেবাগ্রহীতাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য, দলিল লেখকদের সাথে সেবাগ্রহীতাদেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের (আত্মীয় বা পরিচিত) ভিত্তিতে এবং দলিলের ধরণ অনুযায়ী (যেমন: সাফ-কবলা দলিলে বেশি টাকা লাগে আবার হেবা দলিলের ক্ষেত্রে কম লাগে ইত্যাদি) কম-বেশি হয়ে থাকে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে দলিল নিবন্ধনের ধরণভেদে দলিলের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে দলিল লেখকদের প্রতি লাখে ১-৩% পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতি লাখের হিসেবে নয় বরং থোক বা প্যাকেজ আকারে টাকা সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে দলিল লেখকরা নিয়ে থাকে। যখন দলিলের মূল্য অনেক বেশি হয় সেসব ক্ষেত্রে এভাবে নেওয়া হয়। একজন সেবাগ্রহীতা জানান যে, তার জমির পরিমাণ ৬ শতক এবং ক্রয়মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দালালকে দিয়েছেন ৪,৭৫,০০০ টাকা। তার ধারণা সবকিছু মিলে নিবন্ধনের জন্য ৪ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকার মতো খরচ হতে পারে। কিন্তু তিনি দলিল লেখককে মোট খরচের থেকে ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা বেশি দিয়েছেন। এছাড়া তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে ক্ষেত্রবিশেষে দলিল লেখকের সহকারীকেও কিছু টাকা দিতে হয়।

"দলিল লেখক পারিশ্রমিক হিসেবে ১০,০০০ টাকা চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে কমিয়ে ৫০০০ টাকায় কাজটি করে দিচ্ছেন। পারিশ্রমিক কত হবে সেটি নির্ভর করে সেবাগ্রহীতা এবং দলিল লেখকের মধ্যকার সম্পর্কের উপর। দলিলের মূল্য যদি ১ কোটি হয় তাহলে পারিশ্রমিক ১ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া কোন সেবা গ্রহীতা যদি সচেতন না হন বা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে না জানেন তাহলে তার কাছ থেকে ইচ্ছেমত টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়।"-একজন তথ্যদাতা

দলিল লেখক সমিতির অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ: সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল লেখায় নিয়োজিত দলিল লেখকদের একটি সমিতি থাকে। সংশ্লিষ্ট দলিল লেখক সমিতিতে দলিল লেখকদের দলিল প্রতি নির্দিষ্ট হারে টাকা জমা দিতে হয়। এই টাকার পরিমাণও ক্ষেত্র বিশেষে বা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কম বা বেশি হয়ে থাকে। যেমন- কোনো এলাকায় দলিল বা নোটিশ প্রতি দলিল লেখক সমিতিকে ৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়, কোথাও ১০০০, আবার কোথাও ৫০০০ টাকা দিতে হয় চাঁদা হিসেবে। গবেষণার আওতাভুক্ত সকল এলাকার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দলিল লেখকদের দলিল লেখক সমিতিতে ৫০০ টাকা - ৫০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে হয়। দলিলের প্রকারভেদ এবং এলাকা অনুযায়ী চাঁদার পরিমাণে পার্থক্য হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিলের মূল্য হিসেবে এই টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যেমন- প্রথম লাখে সমিতিতে দিতে হয় ১০০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি লাখে ৫০০ টাকা করে দিতে হয়। ৫ লাখ পর্যন্ত এই রেট বহাল থাকে। এছাড়া প্রতিটি নকল উত্তোলনের জন্যও দলিল লেখক সমিতিকে টাকা দিতে হয়।

দলিল লেখকদের সমিতি শক্তিশালী এবং এর পেছনে জেলা রেজিস্টার ও সাব-রেজিস্ট্রারদেও একাংশের সমর্থন আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উত্তোলিত অর্থ দিয়ে সমিতির বিভিন্ন খাতের খরচ চলে। যেমন-কেউ অসুস্থ হলে সাহায্য, বাৎসরিক পিকনিক ইত্যাদি। আবার দুই ঈদে এটাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে (উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন) অর্থ প্রদান করতে হয়। এ ফান্ড থেকে কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিক (যাতে কোনো প্রতিবেদন না করে) ও স্থানীয় পর্যায়ে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের কিছু অর্থ দেওয়া হয়।

ভূমি দলিল নিবন্ধনে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন: অনেক ক্ষেত্রে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের 'অফিস খরচ' হিসেবে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। এই নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ কোথাও নির্দিষ্ট নয়। এই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ কখনো প্রতি লাখে শতকরা হারে, কখনো থোক বা প্যাকেজে আকারে নির্ধারিত হয় এবং জমির মূল্য, শ্রেণী, অবস্থান, দলিলের ধরন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা/না থাকা, এলাকা ইত্যাদি বিষয় অনুযায়ী কম বা বেশি হয়ে থাকে। প্রতি দলিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এই অতিরিক্ত নিয়ম বর্হিভূত টাকা দিতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে দলিল নিবন্ধনের জন্য সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে ১,০০০ থেকে ৫,০০০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এছাড়া নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক থাকলে এক রকম অর্থ এবং ঠিক না থাকলে এই অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া তবে জমির বা দলিলের মূল্য অনেক বেশি হলে সেক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। দলিলের মূল্য যখন কোটি টাকার বেশি হয়ে যায় তখন বার্গেনিংয়ের মাধ্যমে মোট টাকার ২-৫ শতাংশ কমানো যায়। আবার বন্টনসামা, হেবা, বায়না, সংশোধনের এসবের ক্ষেত্রে একটি থোক দিতে হয়। ১০০০-২০০০ টাকার মতো দিতে হয় এসব ক্ষেত্রে।মর্টগেজের দলিল প্রতি ৪০০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত দিতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা জানিয়েছেন যে, সঠিক দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে টিপসই এর জন্য ১০০ টাকা, রশিদের জন্য ১০০ টাকা, ৪ টি পে- অর্ডারের জন্য ২০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। এছাড়া যে ব্যক্তি ব্যাংকে ব্যংক ড্রাফট করতে বা চালান জমা দিতে যায় তাকেও টাকা দিতে হয়।

সেবাগ্রহীতারা বলেছেন যে,'কাগজপত্র ১০০% ঠিক থাকলে এই রেট, আর ঠিক না থাকলে তার কোনো লিমিট নাই।' দলিল যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় বা কোনো প্রয়োজনীয় কাগজ দলিলের সাথে না থাকে তবে সেটার জন্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আরো অনেক বেশি অতিরিক্ত টাকা লাগে। যেমন- জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আয়কর সনদ দেখাতে হয় ক্রেতাকে, এটি না থাকলে ঘুষ দিয়ে তা ঠিক করতে হয়। এছাড়া দলিলে অন্যান্য সমস্যা থাকলে যেমন দাগ নম্বর ভুল এবং সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকলে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া আটকিয়ে দেয় এবং আরো অতিরিক্ত টাকা চেয়ে বসে কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

> " এক লাখ টাকার ইউনিয়ন পরিষদের একটা জমি রেজিস্ট্রি হলে ৯ হাজার টাকা ব্যাংকে দিতে হয়। আর ৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়। এর মধ্যে ২ হাজার টাকা দলিল লেখক পারিশ্রমিক হিসেবে নেয়। জানান, আগে দলিল লেখক পারিশ্রমিক নিতো ৫০০ টাকা, আর এখন সেটি বাড়ি হয়েছে ২ হাজার টাকা। আর দলিল লেখক সমিতি নেয় ১৫০০ টাকা। আর সাব রেজিস্ট্রায় নেয় ৮০০ টাকা। জানান, আগে সাব রেজিস্ট্রার নিতো ৪০০ টাকা। কম্পিউটার কম্পোজ করাতে লাগে ৫০০ টাকা। আর স্ট্যাম্প বাবদ খরচ হয় ৭০০ টাকা।" - একজন তথ্যদাতা

যদিও দেখা গেছে যে এই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ কোথাও নির্দিষ্ট নয়, তারপরও কোথাও কোথাও এ অর্থ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট লিখিত বা অলিখিত মূল্য ধার্য করা রয়েছে যা শুধুমাত্র ঐ অফিসের জন্য প্রযোজ্য হয়। নিচের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কবলা দানপত্র দলিলের মূল্যের পার্থক্য বা সীমা অনুযায়ী ১২০০ টাকা থেকে ১২,২০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। একইভাবে, দলিলের মূল্যের পার্থক্য বা সীমা অনুযায়ী হেবা ঘোষনাপত্রের জন্য ১২০০-৫২০০ টাকা, বাটোয়ারা দলিলের জন্য ফি বাদে ৩২০০-১০২০০টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। অপরদিকে নকল দাখিলের জন্য ৮০০ টাকা এবং কমিশনের জন্য জে ওয়ান ফি সহ ৪০০০ টাকা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ হিসেবে নেওয়া হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য দলিলের (যেমন- বন্ধকী দলিল, আমমোক্তারনামা, বায়না দলিল, সংশোধন দলিল, ঘোষণাপত্র দলিল ইত্যাদি) জন্য নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ বা রেট অঘোষিতভাবে নির্ধারণ করা আছে।

চিত্র-৬.২.১: গবেষণার আওতাভূক্ত একটি এলাকার একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

কবালা দান পত্র

৬,০০০-৫০,০০০	= ১২০০/=
৫১,০০০-২,০০,০০০	= ১৭০০/=
২,০১,০০০-৩,০০,০০০	= ২২০০/=
৩,০১,০০০-৫,০০,০০০	= ২৭০০/=
৫,০১,০০০-১০,০০,০০০	= ৩৭০০/=
১০,০১,০০০-১৫,০০,০০০	= ৪২০০/=
১৫,০১,০০০-২৫,০০,০০০	= ৪৭০০/=
২৫,০১,০০০-৩৫,০০,০০০	= ৫২০০/=
৩৫,০১,০০০-৫০,০০,০০০	= ৬২০০/=
৫০,০১,০০০-১,০০,০০,০০০	= ৮২০০/=
১,০০,০০,০০০/- তদউর্ধ্ব	= ১২,২০০/=
হেবা ঘোষণাপত্র ফি সহ ৬,০০০/- ৩,০০,০০০/-	= ১২০০/=
হেবা ঘোষণাপত্র ফি সহ ৩,০১,০০০/- ১০,০০,০০০/-	= ২২০০/=
হেবা ঘোষণাপত্র ফি সহ ১০,০০,১০০০/- ২০,০০,০০০/-	= ২৭০০/=
হেবা ঘোষণাপত্র ফি সহ ২০,০০,১০০০/- ৫০,০০,০০০/-	= ৩২০০/=
হেবা ঘোষণাপত্র ফি সহ ৫০,০১,০০০/- তদউর্ধ্ব	= ৫২০০/=
বন্ধকী দলিল ফি বাদে	= ২২০০/=
বন্ধকী দলিলের সহিত আমমোক্তার	= ২৭০০/=
সাধারণ আমমোক্তার নামা দলিল ফি সহ	= ১৭০০/=
বাটোয়ারা দলিল ৬০০০- ২০,০০,০০০/- ফি বাদে	= ৩২০০/=
বাটোয়ারা দলিল ২০,০১,০০০ -৫,০০,০০,০০০/- ফি বাদে	= ৫২০০/=
বাটোয়ারা দলিল ৫০,০১,০০০ - ১,০০,০০,০০০/- ফি বাদে	= ৬২০০/=
বাটোয়ারা দলিল ১,০০,০১,০০০ তদউর্ধ্ব ফি বাদে	= ১০২০০/=
বায়নাপত্র দলিল ফি বাদে	= ২২০০/=
ঘোষণাপত্র দলিল ফি সহ	= ২২০০/=
সংশোধনপত্র দলিল ফি সহ	= ২২০০/=
স্মরণলিপি দলিল ফি সহ	= ২২০০/=
বায়না বাতিল দলিল ফি বাদে	= ২২০০/=
আমমোক্তার বাতিল দলিল ফি সহ	= ২২০০/=
কমিশন জে ওয়ান ফি সহ	= ৪০০০/=
নকল দাখিল	= [illegible]০০/=

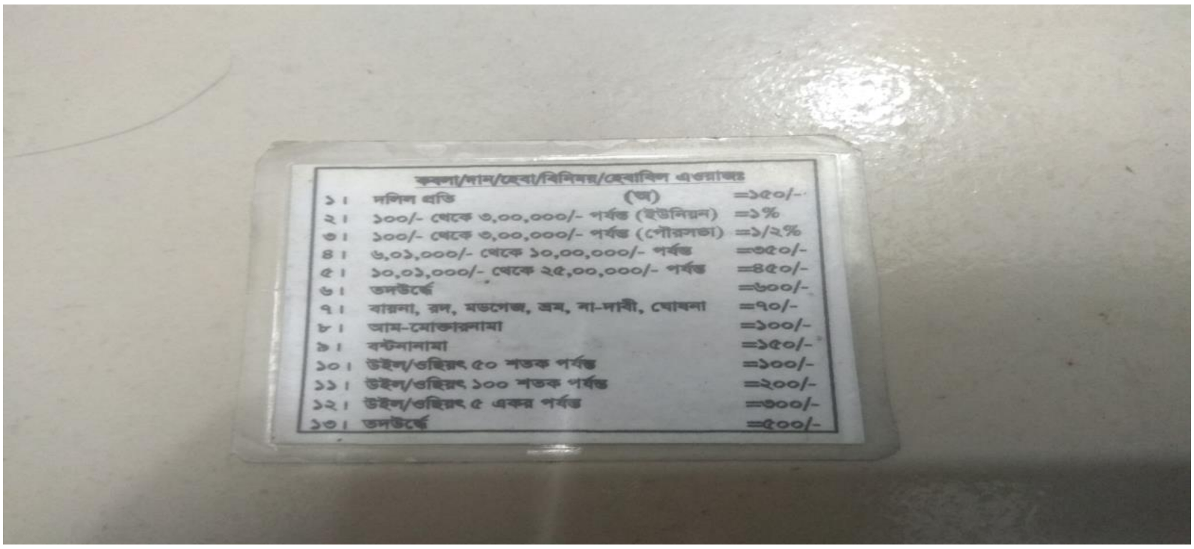

এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানান যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলো এ ধরনের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে হয়ে থাকে। এই লেনদেনগুলো এমন সুক্ষ্মভাবে করা হয় যে সাধারণভাবে এগুলো থাকে যা ধরাছোয়ার বাইরে। যেমন-রজিস্ট্রেশন করার সময় দলিলে সাংকেতিক চিহ্ন বা কোড নং ব্যবহার করা হয় যা দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বুঝতে পারেন যে এই দলিলে জন্য নির্ধারিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়েছে বা তার নিশ্চয়তা রয়েছে। এভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিল রেজিস্ট্রেশন হয়।

তথ্যদাতারা জানান যে যেহেতু প্রতি দলিলে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয় ফলে দিন শেষে একটি সাব-রেজিস্ট্রারঅফিসে অনেক অর্থ জমা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দৈনিক ১০০টি নিবন্ধন দলিল সম্পাদিত হয় এবং প্রতি দলিলের জন্য যদি ১০০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় তবে উক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দৈনিক ১,০০,০০০ টাকা জমা হয়। দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার পর দলিল লেখকরা অফিসে এসে টাকা দিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় যোগসাজশের মাধ্যমে হয় এবং এ সাথে সাব-রেজিস্ট্রার, সহকারী, মোহরার, নকলনবীশ, দলিল লেখকদের একাংশ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিদিনের এই জমাকৃত অর্থ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (সাব-রেজিস্ট্রার, অফিস সহকারি, মোহরার, পিয়ন, নকলনবীশ ইত্যাদি) নিজেদের মধ্যে পদ অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নিয়ে থাকেন। এই টাকা ভাগাভাগিও বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও পদ অনুযায়ী ভাগ নির্ধারিত থাকে। তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে অভিযোগ রয়েছে যে দলিল প্রতি উত্তোলিত মোট অর্থ শুধুমাত্র উক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেই বন্টণ হয় না বরং এই টাকার অংশ উপরের দিকে যায়। অর্থাৎ এই অর্থের অংশ জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, নিবন্ধন অধিদপ্তর পর্যন্ত যাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

> "সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সারাদিনে যত টাকা আদায় হয় তা বিকাল পাঁচটার পর গেট বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।"- একজন তথ্যদাতা

> "ক্ষেত্র বিশেষে একটি দলিল করতে ২/৩ লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। এভাবে প্রতিদিন অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আয় করছে সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস। পাঁচ লাখ টাকা অবৈধভাবে আয় করলে তার অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই লাখ টাকা দিতে হয় সাব-রেজিস্টার, এক লাখ সহকারি, তিন মোহরার (৩০*৩) ৯০ হাজার, পিয়ন ২০ হাজার টাকা ভাগ পায়"-একজন তথ্যদাতা

নিয়ম-বর্হিভূতভাবে আদায়কৃত মোট অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে বেশি অংশ পায় সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্টার এবং তা মোট টাকার ১০-৫০ শতাংশ। এই টাকার বাকি অংশ অফিসের সকলের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রারকে দলিল প্রতি একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকা প্রদান করতে হয় এবং কমিশন বা অন্য কোনো কাজের জন্য থোক অর্থ প্রদান করতে হয়। কতগুলো দলিল হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিলে লিখিত মূল্যের ওপর ভিত্তি করেও অনেক সময় সাব-রেজিস্ট্রার অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে থাকে। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে প্রতিটি দলিল নিবন্ধনের জন্য জেলা রেজিস্টার অফিসের জন্যও নির্দিষ্ট অংকের টাকা কেটে রাখা হয়। তথ্যদাতারা জানান, একটি জেলায় যতগুলি সাব-রেজিস্ট্রির অফিস আছে এবং এই অফিসগুলোতে প্রতি সপ্তাহে যত সংখ্যক দলিল রেজিস্ট্রেশন করা হয়, সে হিসেবে দলিল প্রতি তার একটা টাকা জেলা রেজিস্টার অফিসে চলে আসে।

"জমির পরিমাণ ছিল ২৪ শতাংশ। প্রতি শতাংশ জমি বিক্রয় হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা দরে। জমির মালিক বিদেশে থাকার কারণে জমিটি কমিশন রেজিস্ট্রি হয়েছে। এই জমিটি রেজিস্ট্রির জন্য সাব-রেজিস্টারকে ২ লক্ষ টাকা নিয়ম-বর্হিভূতভাবে প্রদান করতে হয়েছে।"- একজন তথ্যদাতা

দলিলের নকল উত্তোলনে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ: একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পর সাথে সাথে মূল দলিল সেবাগ্রহীতা বা দলিল সম্পাদনকারীকে দেওয়া হয় না। কারণ মূল দলিলটি বালামে তোলার জন্য বেশ কিছু সময় লাগে। তাই রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পর সেবাগ্রহীতা বা দলিল সম্পাদনকারীকে একটি রশিদ দেওয়া হয়, পরবর্তীতে যা দেখিয়ে তিনি মূল দলিল সংগ্রহ করতে পারেন। সাধারণত দলিল হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর দলিলের সার্টিফাইড কপি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন কাজে এই রেজিস্ট্রেশনকৃত দলিলের সার্টিফাইড কপি প্রয়োজন হয়, এসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত সরকারি ফি প্রদানের মাধ্যমে মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি বা দলিলের নকল তোলা যায়। মূল দলিল হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই কপি দিয়েই মিউটেশন, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় কাজ করা সম্ভব। আবার অনেক সময় মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলেও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে উক্ত দলিলের নকল কপি উত্তোলন করা যায়।

এ গবেষণায় দেখা গেছে যে এই দলিলের নকল কপি উত্তোলনের জন্য অনেক সেবাগ্রহীতারা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের রেকর্ড রুমে আসেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে এই উক্ত দলিলের নকল কপি উত্তোলনের জন্য তাদেরকে সরকারি নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। সাধারণভাবে একটি দলিলের নকল উঠাতে নিম্নলিখিত খাতে এবং হারে সরকারি খরচ হয়।

সারণি- ৬.২.১: একটি দলিলের নকল উত্তোলণে সরকারি খরচ

খরচের খাত	টাকার পরিমাণ
সূচি বই তল্লাশির জন্য:	
- এক বৎসরের জন্য ;	২০/-
- একাধিক বৎসরের ক্ষেত্রে, প্রথম বৎসরের জন্য;	২০/-
- অতিরিক্ত পরবর্তী বৎসরের জন্য	১৫/-
(তবে শর্ত থাকে যে, তল্লাশীর ক্ষেত্রে ফি'র পরিমাণ ১৫০/- অধিক হবে না)	
রেজিস্ট্রার বই পরিদর্শনের জন্য:	
- ১,৩ ও ৪ নং বই এ অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি নকল বা অন্যান্য রেজিস্ট্রার বা বই বা কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল বা নথির পৃষ্ঠা পরিদর্শনের জন্য	১০/-
দলিলের নকল প্রস্তুতকরণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে:	
- বাংলায় প্রতি ১০০ শব্দের জন্য	১০/-
- ইংরেজি ভাষায় প্রতি ১০০ শব্দের জন্য	১৫/-
জরুরী ফি বা প্রার্থিত নকলের জন্য অগ্রাধিকার চাইলে	৫০/-
- যদি নকলটি প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০০ শব্দ-বিশিষ্ট চার পৃষ্ঠার অধিক হয় তাবে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য	১৫/-

অপরদিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় দুই বছরের পুরোনো পাঁচ পৃষ্ঠার একটি দলিলের নকল উঠাতে সরকারি খরচ এবং বাস্তবে এ ধরনের দলিল উত্তোলনে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ:

সারণি- ৬.২.২: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় দুই বছরের পুরোনো পাঁচ পৃষ্ঠার একটি দলিলের নকল উঠাতে সরকারি খরচ

খরচের খাত	টাকার পরিমাণ	এ ধরণের দলিল উত্তোলণে বাস্তবে নেওয়া হচ্ছে (টাকায়)
সূচি বই তল্লাশির জন্য:		১০০০-১২০০
- এক বৎসরের জন্য ;		
- একাধিক বৎসরের ক্ষেত্রে, প্রথম বৎসরের জন্য;	৩৫/-	
- অতিরিক্ত পরবর্তী বৎসরের জন্য		
(তবে শর্ত থাকে যে, তল্লাশীর ক্ষেত্রে ফি'র পরিমাণ ১৫০/- অধিক হবে না)		

রেজিস্ট্রার বই পরিদর্শনের জন্যঃ - ১,৩ ও ৪ নং বই এ অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি নকল বা অন্যান্য রেজিস্ট্রার বা বই বা কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল বা নথির পৃষ্টা পরিদর্শনের জন্য	১০/-	
দলিলের নকল প্রস্তুতকরণ বা প্রদানের ক্ষেত্রেঃ - বাংলায় প্রতি ১০০ শব্দের জন্য - ইংরেজি ভাষায় প্রতি ১০০ শব্দের জন্য	১৫০/-	
জরুরী ফি বা প্রার্থিত নকলের জন্য অগ্রাধিকার চাইলে - যদি নকলটি প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০০ শব্দ-বিশিষ্ট চার পৃষ্ঠার অধিক হয় তাবে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য	৭৫/-	
সরবরাহকৃত স্ট্যাম্পের মূল্য	২৫	
সরবরাহকৃত কার্টিজ কাগজের মূল্য	২৫	
নকলের মোট খরচ	৩২০	

কিন্তু তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বিভিন্ন ধরণের দলিলের ক্ষেত্রে দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য তাদেরকে সাধারণভাবে ১০০০ থেকে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে হয়েছে। সাধারণত দলিলের মেয়াদ, এলাকা, দলিলের ধরণ, আকার ও প্রাপ্তির সময় অনুযায়ী নকল উত্তলনের খরচ কম বেশি হয়। বিশেষ করে কোনো বালাম যদি ছেঁড়া থাকে, অনেক পুরোনো থাকে, তখন নকল তুলতে বেশি টাকাও লেগে যায়।

কেস স্টাডি-৬.২.১:

জনাব হাকিমের (ছদ্দনাম) জমি-জমার ৭ টি মূল দলিল উইপোকা দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় পুনরায় তার দলিলগুলোর নকল উত্তলোনের প্রয়োজন হয়। মোট ৭টি দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য প্রথমে তিনি স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে যান। সেখানে অফিসের কর্মচারীরা একজন দালালের মাধ্যমে কাজ করাতে বলেন। তিনি দালালের সাথে দরকষাকষি করে প্রতি দলিলে ২৫০০ টাকা অনুযায়ী ৭ দলিলের জন্য ১৭৫০০ টাকার ধার্য হয়। এর মধ্যে অগ্রীম হিসেবে তিনি ৬০০০ টাকা দালালকে প্রদান করেন। কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও দলিল গুলো দিতে না পারায় দালালকে টাকা ফেরত দিতে চাপ প্রয়োগ করেন সেবাগ্রহীতা। অবশেষে ২টি দলিলের নকল দিতে সক্ষম হয় সে, বাকি দলিলগুলো জেলা রেকর্ড রুমে আছে জানিয়ে সে ৫০০০ রেখে বাকি টাকা ফেরত দেয়।

পরবর্তীতে তিনি জেলার রেজিস্ট্রার অফিসের রেকর্ড রুমে যান। এখানেও একইভাবে দালালরা দলিল প্রতি ৩-৫ হাজার টাকা দাবি করে । এখানেও দালালদের সহায়তা নিতে পরামর্শ দেন রেকর্ড কিপার। ১ টি দলিলের জন্য রেকর্ড কিপার ১০০০ টাকা রাখেন। আর তল্লাশির জন্য দালাল প্রতি দলিল খুঁজতে প্রথমে ২০০ এবং দলিলগুলোর সাল বোঝা না যাওয়ায় আরো ৩০০ টাকা অর্থ্যৎ মোট ৯০০ টাকা দাবি করেন। এর কমে তল্লাশি হবে না বলে জানানো হয়। দলিল নম্বর ছাড়া নকল উত্তলোনও সম্ভব নয় বিধায় সে ৯০০ টাকা তল্লাশি বাবদ দিয়ে তল্লাশির ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করেন।

গবেষণায়, দলিলের নকল তোলার জন্য নকলনবীশদের ভূমিকার কথাই বেশি উঠে এসেছে। নকল উত্তোলনের প্রকৃত খরচ বা সরকারি ফি বাদে বাকী অর্থ নকলনবীশরা নিয়ে থাকে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় নকলবীশরা নিজেরাই বলেছে যে তারা দলিলের নকল প্রদান বাবদ তারা সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত বা বকশিশ হিসেবে নিয়ে থাকে। তথ্যদাতারা জানান যে নকলনবীশদের মূল আয় এই অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকা। বালাম লিখে মাসে হয়তো তারা ৩-৪ হাজার টাকা আয় করে যা দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অতিরিক্ত টাকা অফিস স্টাফরা ভাগ করে নিয়ে থাকে। নকলনবীশ ছাড়াও দলিলের নকল উত্তেলণে সাব-রেজিস্ট্রার (৫০-১০০ টাকা), অন্যান্য কর্মচারী (১০-৩০ টাকা), রেকর্ডকিপার (২০০ টাকা) এবং দলিল লেখক সমিতিতে (২০০ টাকা) টাকা দিতে হয়। এছাড়া মূল দলিল বা বালাম সার্চ বা তল্লাশীর জন্য তল্লাশীকারককেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। দলিল তল্লাশির ক্ষেত্রে প্রতি সালের জন্য ৫০-১০০ টাকা নেয়ার কথা থাকলেও ৫০০ টাকা না দিলে কাজ হয়না। অনেক সময় দেখা যায় একমাসেও নকল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন অতিরিক্ত টাকা দিয়ে নকল বের করতে হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে নকল উত্তোলন বাবদ আদায়কৃত অর্থের ভাগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একাংশের নিকটও যায়। মূলত দলিল লেখকরাই নকলের কাজগুলো নকলনবীশদের কাছে পাঠায়। আবার অনেক সেবাগ্রহীতা ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা পরিচিতির মাধ্যমে নকলনবীশদের নিকট আসে। আবার এই অতিরিক্ত টাকা অফিস স্টাফরা ভাগ করে নিয়ে থাকে। তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন যে যেসব সেবাগ্রহীতারা কম সচেতন তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি আদায় করা হয়।

তথ্য প্রদানে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ: এ গবেষনায় তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে তথ্য পাওয়ার জন্যও তাদেরকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। একজন তথ্যদাতা জানান যে তিনি একটি জমি ক্রয় করবেন এবং দলিলের তথ্য যাছাই বাছাইয়ের জন্যই এসেছেন এখানে এবং এই কাজের জন্য তার ৬০০ টাকা খরচ হয়েছে।

৬.৩ প্রতারণা

এ গবেষণায় দেখা গেছে দলিল নিবন্ধনের কাজে নানা ধরণের প্রতারণার ঘটনা ঘটে থাকে। এ প্রতিবেদনে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে দলিল নিবন্ধন ফি অনেক বেশি এবং সেবাগ্রহীতাকে দলিলের মূল্যের ৯%-১১% পর্যন্ত দলিল নিবন্ধনের সময় সরকারি ফি দিতে হয়। এছাড়া যে গড় বাজার মূল্যে ওপর ভিত্তি করে দলিল নিবন্ধন ফি নির্ধারিত হয় সেটিও কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এসব ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এসকল কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রেতা বা দলিল সম্পাদনকারী বা সেবাগ্রহীতারা জমির প্রকৃত মূল্য বা দলিলের প্রকৃত মূল্য না লিখে দলিলে কম মূল্য উল্লেখ করে নিবন্ধন ফি কমাতে চান এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিতে চান। এভাবে তারা প্রতারণার মত অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে যায়। নিবন্ধন আইন ১৯০৮ এর ৬৩(ক) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে দলিলে যথাযথ মূল্য উল্লেখ করা হয় না বা বাজার মূল্য অপেক্ষা কম করা হয় সেক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল দাখিলকারীকে যথাযথ মাশুল ও ফি জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে।

এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানান যে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত মূল্য গোপন করে জমি নিবন্ধনে বড় ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হয়ে থাকে এবং এর সাথে দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা নিজে থেকে দলিলে জমির মূল্য কম দেখানোর কথা বলে আবার কোনো ক্ষেত্রে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের এ ধরনের পরামর্শ দেয়। তথ্যদাতারা বলেন যে পূর্বে প্রকতৃত মূল্যের থেকে অনেক কম মূল্যে দলিল নিবন্ধন এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি ছিল। এই সরকারি রাজস্ব ফাকি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করার জন্যই সরকার জমির শ্রেণী অনুযায়ী জমির বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদিও বর্তমানে সরকার নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্যের থেকে কম মূল্যে কোনো এলাকার জমি নিবন্ধনের জন্য দলিল করা সুযোগ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট জমির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্য নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্যের থেকে অনেক বেশি। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বেশি মূল্যেই জমিটি ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে কিন্তু নিবন্ধনের জন্য প্রস্তুতকৃত দলিলে নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে নিবন্ধন ফি কম করার জন্য। যেমন- কোনো জমির দাম ১০ লক্ষ টাকা হলে এখানে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৯% হারে 'নিবন্ধন ফি' লাগবে (৯০০০*১০) ৯০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে দলিল লেখক-ক্রেতা যোগসাজশের মাধ্যমে জমির দাম কম দেখিয়ে মৌজা রেট অনুযায়ী ৫ লক্ষ টাকা দেখালে সরকারি নির্ধারিত ফি লাগে ৪৫,০০০ টাকা।

> "পৌনে ৬ শতক জমির প্রকৃত মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই দামের বিপরীতে প্রকৃত নিবন্ধন ফি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। জমির দাম কম দেখানোয় জমির নিবন্ধন ফি এসেছে ৫ লাখ টাকা এবং এই যোগসাজশের মাধ্যমে নিবন্ধন ফি কম দেখানোর ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্টার অফিসকে ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছে ৫ লাখ টাকা (সাব-রেজিস্ট্রার, দলিল লেখক, অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এই টাকার ভাগ পেয়েছে)। সরকারি নিবন্ধন ফি ফাঁকি দিয়েছে ১০ লক্ষ টাকা এবং সার্বিকভাবে ৫ লাখ টাকা কম খরচ হয়েছে সেবাগ্রহীতার।"-একজন তথ্যদাতা

এসব ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার পক্ষে এ বিষয়টি যাচাই করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাকে নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত বাজার মূল্য থাকা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতা, দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জোগসাজশে অনেক কম মূল্যে দলিল নিবন্ধন করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেছেন যে, "দুই লাখ টাকার জমি ৫০ হাজার হিসেবে ক্রয়মূল্য দেখালে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ১২-১৩ হাজার ঘুষ দিতে হয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে, এর মধ্যে শুধুমাত্র সাব-রেজিস্টারকে দিতে হয় ১০ হাজার টাকা।"দলিলে জমি বা সম্পত্তির মূল্য কম দেখালে (বিশেষ করে যে জমি বা সম্পত্তির মূল্য অনেক বেশি) নিবন্ধন ফি অনেক কমে আসে এবং দেখা যায় যে তখন সংশ্লিষ্টদের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের পরও সেবাগ্রহীতা আর্থিকভাবে লাভবান হন। পক্ষান্তরে, সরকার অনেক রাজস্ব হারায়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে কিছু ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার বদলে অন্যান্যদের ঘুষ দিতে আগ্রহী হচ্ছেন দলিল নিবন্ধন ফি কিছু কম করার আশায়। এ গবেষণায় সেবাগ্রহীতারা প্রায় সকলেই বলেছেন যে বর্তমান নিবন্ধন ফি অনেক বেশি।

অপরদিকে, শুধুমাত্র দলিলে জমি বা সম্পত্তির মূল্য কম দেখিয়ে নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে দলিলে প্রকৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন করেও নিবন্ধন সম্পাদিত হয় এবং এতেও নিবন্ধন ফি অনেক কমে আসে। কারণ নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্য তালিকায় জমির শ্রেণী অনুযায়ী জমির মূল্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বাস্তু ভিটার জমি ও ডোবা জমির মূল্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ গড় মৌজা মূল্য তালিকা অনুযায়ী বাস্তু ভিটার জমির মূল্য বেশি এবং ডোবা জমির মূল্য কম। তাই জমির দলিলে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হয় রেজিস্ট্রি খরচ কমানোর জন্য।

"একটি জমি ডাঙ্গা হিসেবে সরকারি ন্যূনতম মূল্য বিবেচনায় দাম ১০ লাখ টাকা হলে সরকার রাজস্ব পাবে ১ লাখ টাকা। এই জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে ধানি করা হলে তখন জমির দাম চলে আসবে ১ লাখ টাকায়। এত সরকার রাজস্ব পাবে ১০ হাজার টাকা, আর রাজস্ব ফাঁকি হয়ে যাবে ৯০ হাজার টাকা। এই ৯০ হাজার টাকার অফিস হয়তো নেবে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা।"-একজন তথ্যদাতা

অপরদিকে, সকল ক্ষেত্রে যে জমির মূল্য কম দেখিয়ে নিবন্ধন করা হয় তা নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাজার মূল্য বা গড় মৌজা মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য দেখিয়ে দলিল নিবন্ধন করা হয়। যেমন- হয়তো জমি কিনছে ১ কোটি টাকা দিয়ে কিন্তু দেখাচ্ছে ১০ কোটি টাকা। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে অনেক সময় সেবাগ্রহীতারা তার সম্পদ ব্যাংকে বন্ধক রেখে লোন নেন। দলিলে সম্পদের মূল্য বেশি দেখানো থাকলে বড় অংকের লোন পেতে সুবিধা হয়। তাই কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতারা মূলত এসব কাজ করে থাকে।

নিম্ন মূল্যে (আন্ডারভ্যালুয়েশন) বা উচ্চ মূল্যে (ওভারভ্যালুয়েশন) যেভাবেই দলিল করা হোক না কেন এসকল ক্ষেত্রে সাধারণ ঘুষের রেটের চেয়ে অনেক বড় অংকের টাকার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়। এছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের ক্ষমতার বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের সাথে সাথে নানা ধরণের তদবির বা সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

"মোহাম্মদপুরে পোনে ২ কাঠা পরিমান আবাসী জমির পাওয়ার অফ এটরনি নিয়েছেন। সেইক্ষেত্রে জমির বাস্তব মূল্য ছিল কাঠা প্রতি ১ কোটি টাকা কিন্তু কমিয়ে কাঠা প্রতি ৩০ লাখ টাকায় এনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এই জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সরকারি ফি হিসেবে ৩০-৩৫ হাজার টাকা লাগার কথা থাকলেও ২ লাখ টাকা লেগেছে তার কাজটি করতে।"-একজন তথ্যদাতা

সেবাগ্রহীতারা নিবন্ধন ফি ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। যেমন- বাস্তবে সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় হলেও তার জন্য বিক্রয় দলিল না করে হয়তো হেবা দলিল প্রস্তুত করে নিবন্ধন করে কারণ হেবা দলিলের নিবন্ধন খরচ কম। এছাড়া, এ গবেষণায় তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় প্রতারণামূলকভাবে এক ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির পরিচয় ধারণ (যেমন- রহিমের পরিবর্তে করিম নিজেকে রহিম বলে পরিচয় দেয়) করে সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হয়ে দলিল সম্পাদন করে। এছাড়া দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির নামে জমির দলিল নিবন্ধন করানো হয়, মৃত ব্যক্তির স্থলে অন্য ব্যক্তি উপস্থিত করে দলিল নিবন্ধন করা হয়। এছাড়া মৃত ব্যক্তিকে জীবীত দেখিয়ে অন্যে ছবি সংযুক্ত করে দলিল নিবন্ধনের অভিযোগ রয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করা হয়। এসকল বিষয়গুলোই নিবন্ধন আইন ১৯০৮ এর ৮২ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।[৪৪]এ সবগুলো ঘটনাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের যোগসাজশে হয়ে থাকে।

৬.৪ জালিয়াতি

নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নানা ধরণের প্রতারণার পাশাপাশি নানা ধরনের জালিয়াতির অভিযোগও পাওয়া যায়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় জালকৃত কাগজপত্র (যেমন- আইডি কার্ড জালিয়াতি, জাল খতিয়ান, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) উপস্থাপন করা হয়। আবার অনেক সময় দলিলে দাতার স্বাক্ষরও জাল করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের জালিয়াতি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের নিবন্ধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যোগসাজশের মাধ্যমেই হয়ে থকে ফলে সহজেই নিবন্ধিত হয়ে যায়।

"সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখক চক্রের সহায়তায় কিছু ভূয়া খতিয়ান তৈরি হয় বালাম বইয়ের পাতা টেম্পারিং এর অভিযোগ আছে রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারিদের বিরুদ্ধে।"-একজন তথ্যদাতা

[৪৪]এ ধরণের অপরাধের জন্য অপরাধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

অপরদিকে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে নিবন্ধকারী কর্মকর্তার পক্ষে তৎক্ষনাৎ কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা সম্ভব হয় না তাই অনেক সময় এ ধরণের জাল কাগজপত্র চিহ্নিত করা সম্ভবও হয় না। এছাড়া নিবন্ধন হয়ে যাওয়ার পরও জাল নিবন্ধন দলিল তৈরী করার জন্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারীদের বিশেষ করে নকলনবীশদের যোগসাজশের মাধ্যমে রেকর্ডরুমে বালামের পাতা ছিঁড়ে ফেলার মত ঘটনাও ঘটে। এছাড়া তথ্যদাতারা অরো উল্লেখ করেন যে দলিল যতক্ষণ পর্যন্ত বালামে না ওঠে, ততক্ষণ ঝুঁকি থাকে কারণ এর মধ্যে যদি কেউ দলিলে পৃষ্ঠা পরিবর্তন করে বা কোনো তথ্য টেম্পারিং করে তখন বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় কাগজপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে অনেক সময় সরকারি সম্পত্তি বা জমিও (খাস জমি, বন বিভাগের জমি, রেলের জমি ইত্যাদি) ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়ার মত ঘটনা ঘটে। আবার প্রতারণার মাধ্যমে এক সম্পত্তি বা জমি অনেকের নিকট বিক্রয় করার জন্য বায়না দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দলিল নিবন্ধন করা হয়।[৪৫]

৬.৫ দায়িত্ব পালনে অবহেলা

অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন এমন অভিযোগ করেছেন তথ্যদাতারা। এ প্রসঙ্গে তারা বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নেওয়া হয় না এবং সম্ভাব্য তথ্য যাচাই করা হয় না। যেমন- অনেক সময় বন্টননামা ঠিক থাকে না কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়।

এছাড়া অভিযোগ রয়েছে যে কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকেন। যেমন- অনেকে নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত থাকেন না। বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রাররা অনেক দেরীতে অফিসে আসে বা অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে ফলে দলিল নিবন্ধনের কাজ শুরু করতে দেরি হয় বা নিবন্ধন হয় না, সেবাগ্রহীতাদের ফেরত যেতে হয়। আবার দেরিতে অফিসে আসার কারণে দেরীতে দলিল নিবন্ধনের কাজ করা হয় কিন্তু এর জন্য সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে লেট ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে তথ্য পাওয়া গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি যথাযথভাব প্রদানের পরও কোনো রশিদ দেওয়া হয় না।

৬.৬ আত্মসাৎ

অন্যদিকে কিছু দলিলের নিবন্ধন ফি সেবাগ্রহীতারা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সরাসরি জমা দেয়। ফলে প্রতিদিন প্রচুর অর্থ উক্ত অফিসে দিন শেষে জমা হয় যা আবার ব্যংকে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এই টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অর্থ জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করে ফেলে। আবার দেখা যায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সাথে জোগসাজশের মাধ্যমে গোপনে দলিল নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ।

৬.৭ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য চাপ

সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য নানা ধরনের চাপ বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রতিবেদনের পূর্বেই বলা হয়েছে যে নকলনবীশদের কাজ শুরু করার অনুমোদন, স্থায়ী পদে নিয়োগ এবং দলিল লেখকদের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ, তদবির তথা রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। ফলশ্রুতিতে এই নকলনবীশ, কর্মচারী ও দলিল লেখকরা অনেক বেশি ক্ষমতায়িত মনে করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে নিয়মভঙ্গের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা জোটবদ্ধভাবে অনিয়ম করার চেষ্টা করে। যেমন-দলিল লেখকরা সিন্ডিকেট করে ফেলে। ফলে সেবাগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হয়। এর কারণ সম্পর্কে তারা বলেন যে কিছু ক্ষেত্রে কেউ কেউ সুযোগ গ্রহণ করতে চায় এবং ভুল দলিলকে সঠিক বলে চালাতে চায়। কিছু ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা রাজনৈতিক চাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন যে কিছু ক্ষেত্রে সরসরি এসে দলিল নিবন্ধন করতে না করা হয়। এছাড়া তারা নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথাও বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তারা বলেন যে, "অনেক সময় ১০/১৫ জন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত লোক এসে বলে আপনি এটা করে দেন বাকীটা আমরা বুঝব। না করলে মার খেতে হয়।" অনেক সময় নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ ব্যবস্থা দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, দলিল লেখকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে তাদের শাস্তি মওকুফ

> "তথ্যদাতা বলেন যে গতকাল তিনি একটি দলিল ফেরত দিয়েছেন, যেটিতে দাগ নম্বর ভুল ছিল। এরপর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি তাকে ফোন দিয়েছেন, কারণ দলিলটি তার জামাতার। তাকে সমস্যাটি জানানো হয়। তিনি বলেন যে আপনাকে করে দিতে বলেছি, করে দেন; আপনার এতো সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা বোঝার দরকার কি?"-একজন তথ্যদাতা

---

[৪৫] 'ওয়ারিতে ১১০ কোটি টাকার সম্পত্তি: একজমি বিক্রির বায়না আটজনের কাছে, ***দৈনিক সমকাল***,১৩ জানুয়ারি, ২০১৯

করে ফেলেন এমন নজিরও আছে। অনেক সময় দলিল লেখকরা সিন্ডিকেট করে ফেলে। এছাড়া উর্দ্ধতন অফিসের খবরদারি এবং অতি প্রভাবের বিষয়গুলোও তথ্যদাতারা উল্লেখ করেন। একজন সাব-রেজিস্ট্রার বলেন যে, "দলিল লেখকরা অনেক শক্তিশালী। দালালের উপদ্রবও আছে। অনেক প্রভাবশালী লোক এসবের সঙ্গে জড়িত। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সাব রেজিস্ট্রারের থাকে না। সাব রেজিস্টারের অনেক ক্ষেত্রে হাত পা বাধা।" একইভাবে নিবন্ধনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও বিভিন্ন বিষয়ে তদবির ও সুপারিশের কথা স্বীকার করেছেন।

৬.৮ কমিশন করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

নিবন্ধন আইন ১৯০৮ এর ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো সেবাগ্রহিতা যদি শারীরীক অক্ষমতাজনিত কারণে নিবন্ধন কার্যালয়ে উপস্থিত হতে অসমর্থ হয়, পর্দানশীন নারী হন বা ফৌজদারী আদালতে জেল খাটেন তবে এসকল বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় সাব রেজিস্ট্রারদেরকে উক্ত ব্যক্তি আবাসস্থলে বা কারাগারে গিয়ে কমিশন করার মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে সাব-রেজিস্ট্রার তার প্রতিনিধিও প্রেরণ করতে পারেন। এছাড়া নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪ এর ৩২ বিধিতে বলা হয়েছে যে এসকল ক্ষেত্রে ভিজিট বা কমিশনের আবেদনের সাথে নির্ধারিত সরকারি ফিস প্রদান করতে হয়।

এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে যদিও কমিশন করা ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে কিন্তু বর্তমানে এর চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতাধর শ্রেণীর ব্যক্তিরা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে যাওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য কমিশনের আবেদন করছেন। এই কমিশন করানোর জন্য তারা নানা ধরণের প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অপরদিকে কমিশনে গেলে কমিশনের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফিস এর বাইরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা অতিরিক্ত অনেক টাকা পেয়ে থাকেন ফলে তারা এ ধরণের কমিশনে যেতে আগ্রহী হন।

৬.৯ সময়ক্ষেপণ

সাধারণত একটি দলিল নিবন্ধনের কাজ সম্পূর্ণ হতে অনেক সময় লাগে। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা প্রায় সবাই বলেছেন যে দলিল রেজিস্ট্রেশনের পর মূল দলিল পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কখনো কখনো মূল দলিল হাতে পেতে আনুমানিক তিন বা চার বছর সময় লেগে যায়। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে জনবল স্বল্পতা, বালাম সরবরাহের ঘাটতি বা নকলনবীশদের কাজের ধীর গতির জন্য মূল দলিল বালামে উঠতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায়। একইভাবে দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য জরুরি ফি দিয়ে আবেদন করলে নকল পেতে সাত দিন লাগার কথা আর সাধারণ ফি দিয়ে করলে হলে ১৫দিন। কিন্তু তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে নকলনবীশদের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার পরও তারা সময় মত দলিলের নকল পান না এবং এই নকল পেতে তাদেও ১৫ দিনের বেশি সময় লাগে। তথ্যদাতারা অভিযোগ জানিয়েছেন যে কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করা হয়। অপরদিকে নকলনবীশরা জানিয়েছে যে দীর্ঘদিনের পুরোনো দলিলগুলোর নকল প্রদানে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় লাগে কারণ অনেক সময় এই ধরণের পুরোনো ইনডেক্স ছেঁড়া পাওয়া যায় এবং বলামগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না বা বালাম অনেক পুরোনো হওয়ার কারণে বালাম থেকে কপি করা অনেক সময়সাপেক্ষ হয়।

> "আবাসি জমির পুরনো দলিল তুলতে এসেছেন। পরিচিত দলিল লেককের মাধ্যমে কাজটি করাচ্ছেন। এ কাজের জন্য দুই দিন এসেছেন এখানে। আরও ১৫ দিন লাগবে বলে দলিল লেখক জানিয়েছেন। দলিল তুলতে ৫-৭ হাজার টাকা লাগছে।"-একজন তথ্যদাতা

> "আমি ৩ মাস আগে এই অফিসের একজন নকলনবীশের কাছে নকলের জন্য ১৩০০ টাকা দেই। ১৯৭৮ সালের দলিল। বলেছিল ১০ দিনের ভেতর দেবে। নকলের নির্ধারিত ফি আমার জানা নেই। নিজে গেলে ঝামেলা হবে এই জন্য তারে দিছি। এই দলিলের জন্য আমি মহেশখালি থেকে ১২-১৩ বার আসছি। দিবে, দিবে বলে ঘুরাচ্ছে। নানা অজুহাত দেখাচ্ছে। আজকে ফোন ধরতেছে না। অফিসের কারো কাছে আমি অভিযোগ করিনি। আজকে না দিলে আমি তাকে মেরে দেব।"-একজন তথ্যদাতা

৬.১০ সেবাগ্রহীতাদের অন্যান্য হয়রানি

উপরোক্ত দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো ছাড়াও সেবাগ্রহীতারা দলিল নিবন্ধনের কাজে নানা হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। যেমন- অতিরিক্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পরও তাদের নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন হয় না এবং আজ হবে কাল হবে বলে তাদেরকে ঘোরায়। এতে সেবাগ্রহীতাদের সময়টাও নষ্ট হয় আবার কাজটাও হয় না। আবার কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পরও আরো অর্থ দেওয়ার জন্য তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

৬.১১ দলিল নিবন্ধন সেবার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি:

সাব-রেজিস্ট্রারনিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জঃ বর্তমানে সাব-রেজিস্ট্রারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তবে কর্মরত সাব-রেজিস্ট্রারদের মধ্যে বিভিন্নভাবে নিয়োগ পাওয়া সাব-রেজিস্ট্রার রয়েছেন। যেমন- মুজিবনগর সরকার কর্মচারীদের নিয়োগ, সরাসরি পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ এবং বিসিএস নন ক্যাডার এর মাধ্যমে নিয়োগ। এছাড়া বিভাগীয় কোটায় (৫%) প্রধান অফিস সহকারি থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাব-রেজিস্টার হওয়া যায়। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানান যে এর মধ্যে মুজিবনগর সরকার কর্মচারীদের নিয়োগ (১৯৭জন) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ তারা মুক্তিযোদ্ধা সনদের মাধ্যমে নিয়োগ পান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন যাদের বয়স ১৯৭১ সালে অত্যন্ত কম ছিল বা মুক্তিযুদ্ধ করার উপযুক্ত ছিল না। এ নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে এবং হাইকোর্টেও স্থগিতাদেশ নিয়ে এ নিয়োগপ্রাপ্তরা চাকুরী করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, যারা বিভাগীয় কোটায় প্রধান অফিস সহকারি থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাব-রেজিস্টার হয়েছেন এমন কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে বিভাগীয় পদোন্নতির সুযোগে এইচএসসি পাস ব্যক্তিও সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও রয়েছে। একজন তথ্যদাতা বলেন যে " সাব-রেজিস্টারদের নিয়োগে ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়। তবে পিএসসি হতে নন-ক্যাডারে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে লেনদেনের মাত্রা কমে গেছে। "

> "প্রধান সহকারি থেকে ৫% সাব-রেজিস্ট্রার করার নিয়ম আছে। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য বা কম শিক্ষিত লোক নিয়োগ পাচ্ছে। আমাদের একজন কলিগ আছে যে প্রধান সহকারি থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাব-রেজিস্ট্রার হয়েছে। সে এসএসসি পাস। আমাদের তার সাথে বসতে হচ্ছে এবং কাজ করতে হচ্ছে। এটা দুঃখ্যজনক। তার কাছ থেকে আপনি কি পেতে পারেন।" -একজন সাব-রেজিস্ট্রার

> "বদলীতে চ্যালেঞ্জ আছে। কেউ কেউ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে আগ্রহী থাকে। তাদের খরচ করতে হয় বেশি। এগুলো করার জন্য মন্ত্রণালয়ে কিছু লোক আছে ওরাই করে। ২০-৫০ লক্ষ পর্যন্ত হয়। আরো বেশিও হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের এসব নিয়ে ভালোই বদনাম আছে। কারো লবিং ভালো থাকলে পোস্টিং এর নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, কিন্তু পয়সা মাফ নেই।"- একজন তথ্যদাতা

সাব-রেজিস্ট্রারদের বদলি সাধারণত দুই বছর পর পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে । তবে নির্ধারিত সময়ের আগে বদলি হওয়ার বিশেষ কারণ থাকলে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস বরাবর আবেদন করতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী এ ধরনের বদলিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বদলির জন্য নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন, প্রভাব বিস্তার বা তদবির করা হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। বিশেষকরে পছন্দনীয় স্থানে (কিছু কিছু এলাকা যেখানে দলিলে সংখ্যা বেশি বা এলাকার দিক দিয়ে অফিসটি গুরুত্বপূর্ণ) বদলি হওয়ার জন্য বড় অংকের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সাব-রেজিস্ট্রারদের বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ৩ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়ে থাকে এবং এলাকাভেদে নিয়ম-বহির্ভূত এই অর্থ লেনদেনের পরিমাণ কম বা বেশি হয় । ঢাকা বা তার আশেপাশের এলাকায় বদলির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থেও লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে ।মূলত ,নিবন্ধন সেবা অধিক দুর্নীতিপ্রবণ হওয়ায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে বদলির বিষয়টি লোভনীয় এবং এক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেশি। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিতে বদলি করা হয়। সেক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নাও লাগতে পারে। এছাড়া বদলির জন্য উচ্চ পর্যায়ে তদবিরের বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন তথ্যদাতা বলেন, "হয়তো কথার কথা বলা যেতে পারে যে এগুলোতে কোনো প্রভাব কাজ করে না। কিন্তু, এগুলোর ক্ষেত্রে মন্ত্রী, এমপি বা এ ধরনের স্তর থেকে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কে কিভাবে কাজ করে আসলো সেটা সেই জানে, আর তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানে। কেউ হয়তো একজন এমপি বা মিনিস্টারকে ম্যানেজ করে কাজ করে আসলো, আবার কেউ হয়তোবা ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজ করে কাজ করে আসলো। এগুলো আমাদের নলেজে আসে না।" অপর একজন তথ্যদাতা বলেছেন, " বদলি ক্ষেত্রে নিবন্ধন অধিদপ্তর অত্যন্ত অমানবিক। স্বামী-স্ত্রী একই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করলে তাদের কাছাকাছি নিয়োগ করার বিধান থাকলেও অধিদপ্তর তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করে না। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জায়গায় বদলি করা হয় যেন বদলিকৃত কর্মকর্তা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করে তদবিরের জন্য। এই তদবিরে মোটা অংকের অর্থ লেনদেন হয়ে থাকে।"

সাধারণত জেলা রেজিস্টারের পদ খালি হলে সাব-রেজিস্ট্রারদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কিছু নির্ধারিত মানদন্ড থাকে। তবে এক্ষেত্রেও একইভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন, প্রভাব বিস্তার বা তদবিরের অভিযোগ রয়েছে।

> “সাব-রেজিস্ট্রারদের জেলা রেজিস্ট্রার হওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব দরকার হয়। এক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন হলেও হতে পারে। তবে আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি নই। শুধু এটুকু বলবো, কোনো কোনো সাব-রেজিস্ট্রারের অধীনে দুই থেকে তিনটিসাব-রেজিস্ট্রার অফিস, নিশ্চয় এর পেছনেও কোনো কারণ আছে। এখানে পকেট ভরার একটা বিষয় থাকে।”- একজন তথ্যদাতা

নকলনবীশ ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ:সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত বিপুল সংখ্যক দলিল বালাম বই এ তোলার জন্য কাজের চাহিদা অনুযায়ী অস্থায়ী মোহরার বা নকলনবীশদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এদের কাজ দলিল ইনডেক্স করা, বালামের কাজ বুঝে নেওয়া, পৃষ্টা অনুযায়ী হিসাব রাখা এবং বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।এটার জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় না। নকলনবীশ হওয়ার জন্য এসএসসি পাস হতে হয়। সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে মহাপরিদর্শক নিবন্ধনের নিকট চাহিদা প্রেরণ করা হয় এবং তার প্রেক্ষিতে নকলনবীশ পদে দরখাস্ত আহবান করা হয়। প্রার্থীরা সাব-রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করে। এরপর মহাপরিদর্শক নিবন্ধনের অনুমোদনক্রমে জেলা রেজিস্টার নকলনবীশদের নিযুক্ত করেন। প্রথমে এই নকলনবিশরা অতালিকাভুক্ত হিসেবে কাজ শুরু করে এবং পরবর্তীতে তালিকাভুক্ত হয়। সাধারণত একটি জেলার স্থানীয় লোকজন স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে নকলনবিশ হিসেবে কাজ করে। যখন কোনো সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কোনো স্থায়ী কর্মচারীর পদ (মোহরার বা পিয়ন বা কম্পিউটার অপরেটর) খালি হয় তখন এই নকলনবিশদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উক্ত পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে একজন নকলনবীশের চাকরি অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হয়। মূলত একটি জেলার সকল নকলনবীশদের মধ্য থেকে এই পদে যোগদানের সময় বিবেচনায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মোহরার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে এই মোহরার পদ থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে অফিস সহকারি বা প্রধান অফিস সহকারি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং একজন নকলনবীশ যেদিন থেকে তালিকাভুক্ত হয় সেদিন থেকে তার জ্যেষ্ঠতা গণনা শুরু হয়।অতালিকাভুক্ত থাকা অবস্থায় জ্যেষ্ঠতা গণনা শুরু হয় না। সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে,নকলনবিশ হিসেবে দীর্ঘদিন (গড়ে ১৫ থেকে ২০ বছর) কাজ করার পর স্থায়ী মোহরার পদে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন।

অপরদিকে সাধারণত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারীদের তিন বছর পর পর একটি জেলা অন্যান্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বদলি করা হয়। তবে জেলার বাইরে তাদের বদলি করা হয়না। জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান অফিস সহকারির বদলি আন্তঃজেলা ভিত্তিক হয়ে থাকে।

নকলনবীশ পদে অতালিকাভুক্তিকরণ, পরবর্তীতে তালিকাভুক্তিকরণ এবং নকলনবীশ থেকে স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ এবং কর্মচারীদেরবদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নকলনবীশ নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে জেলা রেজিস্ট্রারের এখতিয়ারাধীন হলেও এক্ষেত্রে নিবন্ধন অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত ও মনোনয়নই প্রাধান্য পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নকলনবীশ নিযুক্তির জন্য কোনো চাহিদা না থাকলেও নকলনবীশদের কাজ করানোর জন্য উচ্চ পর্যায় থেকে সুপারিশ বা অনুমোদন আসে। একজন সাব-রেজিস্ট্রার বলেন যে “নকলনবিশের ব্যাপারে তিনি কেনো চাহিদা দেন নি। কিভাবে এসেছে তাও তিনি জানেন না।” তিনি মন্তব্য করেন যে ‘পাশ করিয়ে নিয়ে এসছে ওপর থেকে।’

> “এবার একজন মন্ত্রীর এলাকার অনেক লোক তালিকাভুক্ত হয়েছে,কিভাবে হয়েছে আমি জানিনা। নকলনবিশ থেকে মোহরার পদে নিয়োগর ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি অনুযায়ি হয়। তবে একসঙ্গে চার-পাঁচ জন সিনিয়র থাকলে যার প্রভাব আছে সে হয়। এটা যেকোনো ধরনের প্রভাব হতে পারে, বিস্তারিত জানি না। আমি বলতে পারবো না।”- একজন তথ্যদাতা

> “নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বদনাম আছে, তার সত্যতাও হয়তো আছে। নকলনবিশ নিয়োগও যে স্বচ্ছতার ভেতর হয় তা জোর গলায় বলতে পারব না। নকলনবিশরা ভালো বলতে পারবে। তবে জনশ্রুতি আছে দুই লক্ষ টাকার অধিক (২,০০,০০০+)।কীভাবে ট্রানজেকশন হয় জানি না।” -একজন তথ্যদাতা

এছাড়া নকলনবীশদের তালিকাভুক্তি বা কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক সুপারিশ (মেয়র, এমপি মন্ত্রী) বা প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়। এছাড়া তালিকাভুক্ত হওয়ার সময় জেলা রেজস্ট্রার অফিসে অফিসে কিছু অর্থ দিতে হয়। তবে নকলনবিশ পদটি কোনো সরকারি পদ না হওয়ায় এই পদটিকে সরকারিকরণ করার জন্য নকলনবিশরা দাবি জানিয়ে আসছে। একইভাবে নকলনবীশ থেকে স্থায়ী মোহরার পদে নিয়োগের জন্য এবং কর্মচারীদের বদলি ও পদোন্নতির জন্যও অর্থের লেনদেন ও তদবির হয়। নকলনবিশ থেকে মোহরার পদে যোগদানের জন্য

জেলা রেজিস্টার অফিস ও নিবন্ধন অধিদপ্তরে সার্বিকভাবে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে২ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এছাড়া, মোহরার থেকে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতির জন্যনিয়ম-বহির্ভূতভাবে৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হয় সংশ্লিষ্ট ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবং অফিস সহকারী থেকে প্রধান সহকরী পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদানে চ্যালেঞ্জ

অধিকাংশ দলিল লেখক তাদের পিতা, অন্যকোন আত্মীয় বা পরিচিত কারো মাধ্যমে এ পেশায় এসেছেন। দলিল লেখক হিসেবে কাজ করার জন্য এ বিষয়ক লাইসেন্স নিতে হয়। দলিল লেখক হিসেবে কাজ করতে হলে (লাইসেন্স পেতে) তাকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হয় এবং একজন অভিজ্ঞ দলিল লেখকের সাথে সহকারি হিসেবে ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এসএসসির সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হয়। সাধারণত, মহাপরিদর্শক নিবন্ধনের এর সুপারিশক্রমে জেলা রেজিস্ট্রার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। তবে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস বর্তমানে শুধু দলিল লেখক হিসেবে তালিকাভুক্তকরণে কাগজপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ করে থাকে।

> "আগে সাব-রেজিস্ট্রার মাধ্যমে ডিআর বরাবর দরখাস্ত করলে, ডিআর লাইসেন্স দিত বা প্রতিবছর নবায়ন করতো।এ বিষয়ে সাব-রেজিষ্ট্রারের নিজে নিজের এখতিয়ার থাকতো। এখন তো আইজিআর অফিস সব জায়গায় হস্তক্ষেপ করে এবং ওনার সুপারিশে সবকিছু হয়।"-একজন তথ্যদাতা

দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রেও আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক সুপারিশ বা প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ১ লক্ষ থেকে৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এই টাকার অংশ দলিল লেখক সমিতি, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং নিবন্ধন অধিদপ্তর পর্যন্ত দিতে হয়। এসব সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবও কাজ করে। এছাড়া লাইসেন্স প্রদানের জন্য অনেক তদবিরের পাশাপাশি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ লাগে। বর্তমানে দলিল লেখকরা রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে লাইসেন্সের অনুমোদন সংগ্রহ করে । একজন দলিল লেখক বলেন যে "হেড অফিসে দালাল আছে, ওদের সাথে কন্টাক্ট করতে হয়। হেড অফিসে গেলে ওরাই আপনাকে খুঁজে নেবে। কারও সুপারিশ থাকলে তার খরচ একটু কম হয়। এই টাকা আইজিআর অফিসে দিতে হয়।"

> "আমি ৫-৬ বছর আগে সনদ করেছি। আমার পরিচিত লোক ছিল তাই ৬০০০০ টাকায় করতে পেরেছি। লাখ টাকার নিচে সনদ হয় না।"-একজন তথ্যদাতা

আর এ সকল কারণে পরবর্তীতে দলিল লেখকরা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে।এখন যথাযথ নিয়মানুসারে লাইসেন্সহয় না। লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বেশিরভাগ ব্যক্তি আইজিআর অফিসে যোগাযোগ করে। এজন্য খরচ বেশি পড়ে। আবার নিয়মানুযায়ী আবেদন করলে লাইসেন্স পেতে সমস্যা হয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। নিয়মটি হচ্ছে সাব-রেজিস্ট্রার জেলা রেজিস্ট্রার এর কাছে সুপারিশ করবে এবং জেলা রেজিস্ট্রার মহাপরিদর্শক নিবন্ধন বরাবর এ বিষয়ে সুপারিশ করবে। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনেকে মন্ত্রনালয়ের সুপারিশে দলিল লেখকের লাইন্সেস পায়।

> "দলিলের লাইসেন্স পেতে পরিচিত একজনকে ৭০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। এই লাইসেন্স নবায়ন করতে সাধারণত ২০/২৫ হাজার টাকা লাগে কিন্তু পরিচিত হলে ১০/১২ হাজার টাকা লাগে। সমিতিভুক্ত হতে টাকা দিতে হয়। একমাসে সেরকম একটি দলিলের কাজ পেলে একজন দলিল লেখকের সারা মাস কাজ না করলেও চলে।"-একজন তথ্যদাতা

এছাড়া লাইসেন্স পাওয়ার পর একজন দলিল লেখককে দলিল লেখক সমিতিতে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দিতে হয় সমিতিতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য। উল্লেখ্য অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে প্রয়োজনের তুলনায় দলিল লেখকের সংখ্যা অনেক বেশি।

এছাড়া, প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে এই লাইসেন্স রিনিউ বা নবায়ন করতে হয়। দলিল লেখকদের লাইন্সেস নবায়ন ফি (২৫০+ভ্যাট ৩৮) ২৮৮ টাকা। দলিল লেখকরা জানিয়েছেন যে, এক্ষেত্রেও তাদের অফিসে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এই অর্থ প্রদানের পরিমাণ এলাকা ও অফিস অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও এর জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা প্রদান করতে হয়।

> "আমি ২০০৪ সালে সনদ করি। তখন ডিআর অফিস সনদ দিত। আমার সব মিলে ১২০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু এখানে আমার ভাতিজা ২০১৭ সালে সনদ করে তার লেগেছে ৯০,০০০ টাকা তার সাথে যারা করেছে তারা ১,০৫,০০০ টাকা দিয়ে করেছে।"

সপ্তম অধ্যায়
ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায়সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

৭.১ দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ

আইনি,পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা: দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়াসহ অনেকগুলো আইন, বিধিমালা ও সরকারি পরিপত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দলিল নিবন্ধনের কিছু আইন ও বিধিতে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবংকিছু ক্ষেত্রে আইনি বিধানগুলোর কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে নিবন্ধন ফিস এবং সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণে সমস্যা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহজে যাচাই এর ব্যবস্থা না থাকা এবং সর্বোপরি আইনের বিভিন্ন বিধানের কার্যক্রর প্রয়োগ না হওয়ায় দুর্নীতির সুযোগ বাড়ছে, সরকারের রাজস্ব হারাচ্ছে এবং সেবাগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা: নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি, নিয়োগ বদলী পদোন্নতিতে দুর্নীতি অন্যতম। অধস্তন আদালতগুলোতে অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে দলিল নিবন্ধন ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ঘাটতি মেটাতে কর্মকর্তাদের দলিল লেখকদের ওপর নির্ভর করতে হয় এবংদলিল লেখকরা এই দায়ভার সেবাগ্রহীতাদের ওপর চাপান অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায় করে। এছাড়া দেখা যায় নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজের চাপ বিরাজ করছে এবং কাজ বাকী রয়ে যাচ্ছে ফলে সময়মত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। যেমন- নিবন্ধনের পর মূল দলিল পেতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

নিবন্ধন সেবায় আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি:আমাদের দেশের সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও জেলা রেকর্ড রুমগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভান্ডার। বহু পুরোনো দলিল (১৮০০ সালের দিকের দলিল) এ অফিসগুলোতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ গবেষণায় দেখা যায় যে এ দলিলগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষেণে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া এখনো পুরোনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কাজ করা হচ্ছে এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে যথাযথভাবে নিবন্ধন সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি:এ গবেষণায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলো থেকে তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা বা তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আদালতে তথ্য পেতে সংশ্লিষ্টদের নানা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। অফিস প্রাঙ্গণে নিবন্ধন সেবা , ফি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য সম্বলিত তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার থাকলেও তা খুব কার্যকর না। এছাড়া নিয়মিত সিএজি অডিট বা আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের বাধ্যবধকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি: দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কার্যক্রম জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিয়মিত এবং যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে। দেখা যায় যে ,কিছু ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। এছাড়া গবেষণায় আরো দেখা যায় যে,কর্মচারী ও নকলনবীশদের কার্যক্রম তদারকিতেও ঘাটতি বিদ্যমান এবং তাদের অনিয়ম দুর্নীতি বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অপরদিকে দলিল লেখকরাও অনেক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাচ্ছে না। এসবের ফলে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে, দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে জবাবদিহিতা কাঠামো কার্যকর হচ্ছে না। এছাড়া দেখা যায় যে অফিসগুলোতে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা না থাকায় দুর্নীতি অনিয়মের তথ্য প্রকাশিত হয় না এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। এছাড়া দুর্নীতি বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হার অনেক কম। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, সাধারণত সেবাগ্রহীতারাও দুর্নীতি বা হয়রানির অভিযোগ জানাতে চান না। কারণ অভিযোগ করলে তার দলিল নিবন্ধন বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

সেবাগ্রহীতাদের সচেনতার অভাব এবং দলিল লেখকদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা: দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যথেষ্ট সচেনতার অভাব রয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের বাইরে তথ্যবোর্ড টানানো থাকলেও সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না বা সেবাগ্রহীতারা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারছেন। ফলে কিভাবে নিবন্ধন করতে হবে, কত খরচ হবে সে সম্পর্কে তারা খুব বেশি জানেন না। দেখা যায় যে, এসব কারণে তাদের দলিল লেখকদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা রয়েছে এবং দলিল লেখকরা তাদের জিম্মি করে ফেলছে।

রাজনৈতিক প্রভাব: এ গবেষণায় নিবন্ধন সেবা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক নানা কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে নকলনবীশ নিয়োগ এবং দলিল লেখকের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবির কাজ করে। এছাড়া নিবন্ধনের কাজেও সাব-রেজিস্ট্রাররা কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ অনুভব করেন বলে জানিয়েছেন।

সমন্বয়ের অভাব: ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম মূলত ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে[৪৬]। এই প্রাতিষ্ঠানিক বিভক্তির ফলে মাঠপর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ভূমি নিবন্ধন এবং সেই অনুসারে খতিয়ান হালনাগাদের কাজ হওয়ার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা হয় না।

৭.২ *দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল*

প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত: এ গবেষণায় দেখা যায় যে, নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতেপ্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি বিশেষ করে অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতির কারণে দলিল নিবন্ধন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে।

দলিল নিবন্ধন কম হওয়া: নিবন্ধন ফিস বেশি হওয়া, সম্পত্তির বাজার মূল্য বাস্তবসম্মত না হওয়া এবং দুর্নীতির কারণে সেবাগ্রহীতারা দলিল নিবন্ধনে আগ্রহী হচ্ছে না এবং দলিল নিবন্ধন কম হচ্ছে বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। অনেকে রেজিস্ট্রেশন করছে না। অনেকে নিজেদের মধ্যে হলে দানপত্র করে নিচ্ছে। এসবের ফলশ্রুতি হিসেবে বছরে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। নিচের চিত্র থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার বোঝা যায়। দেখা যাচ্ছে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে থেকে এই সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল ৪৫,৬৫,২৩০ এবং পরবর্তী বছরগুলোতে কমে এই সংখ্যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে হয়েছিল ৩১,৯৮,৯২০টি। পরবর্তীতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই সংখ্যা আবারও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা কমলেও রেজিস্ট্রেশন ফি বৃদ্ধির কারণে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৭.৩.১: বছরভিত্তিক নিবন্ধিত দলিলের সংখ্যার নিম্নগতি[৪৭]

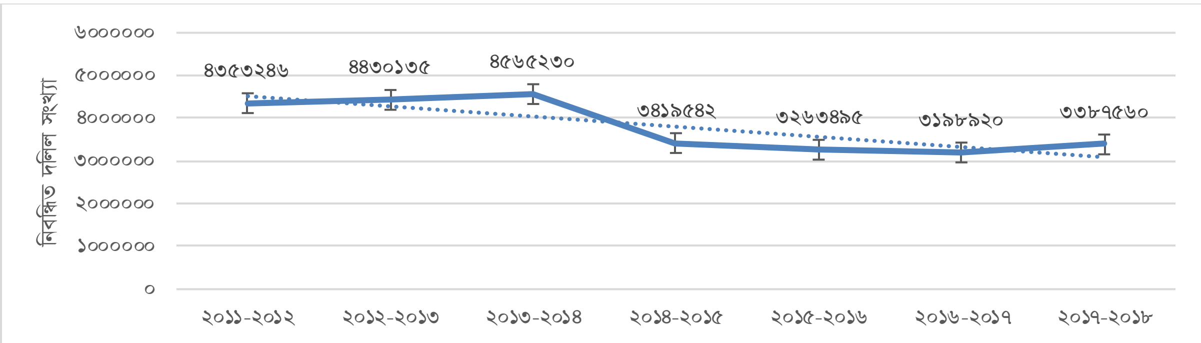

দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন: নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে নানাবিধ সুশাসনের ঘাটতি বিশেষ করে জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ঘাটতির ফলশ্রুতিতে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে নিয়মে পরিণত হচ্ছে। সেবাগ্রহীতাদের নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও ভোগান্তি: সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে নিবন্ধনের কাজে এসে সেবাগ্রহীতাদের নানা হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এর মধ্যে সময়মত নিবন্ধন না হওয়া, নিবন্ধনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়া অন্যতম।

৭.৩ *দলিল নিবন্ধন সেবায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব*

[৪৬]ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪

[৪৭]রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান, বিস্তারিত দেখুন: http://rd.portal.gov.bd/site/page/b7ad77c1-213d-49bf-ae15-9ddf3b9b1261/-

সেবাগ্রহীতাদের যথাযথভাবে নিবন্ধন সেবা প্রদান ব্যাহত হওয়া: এ গবেষণায় দেখা যায় যে, দলিল নিবন্ধন সেবায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির ফলে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের যথাযথভাবে নিবন্ধন সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারের রাজস্ব হারানো: দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করে যেসকল ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ এবং তদের ওপর জনগণের আস্থার ঘাটতি: দলিল নিবন্ধন সেবায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির সামগ্রিক প্রভাব হিসেবে নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে জনগণের আস্থার ঘাটতি হচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে নিবন্ধন সংশিষ্ট অফিসগুলোতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয় বা টাকা ছাড়া সেখানে কোনো কাজ হয় না এবং দলিল নিবন্ধন নিয়ে তাদের মনে ভীতি সৃষ্টি হচ্ছে।

সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া: দলিল নিবন্ধন করতে গিয়ে নানা ধরনের দুর্নীতি অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হওয়ার ফলে সেবাগ্রহীতারা আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

সারণি-৭.৩.১: দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ • প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি, নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতিতে অনিয়ম) • পুরোনো ম্যানুয়ালভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধন সেবা আধুনিকায়নে ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি • কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি • স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি • সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতায় ঘাটতি এবং দলিল লেখকদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা	• নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক ও নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • ঘুষ, প্রতারণা ও জালিয়াতিসহ জোগসাজশের মাধ্যমে নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন • দলিল নিবন্ধন কম হওয়া • সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ক্ষতি, হয়রানি ও ভোগান্তি	• সেবাগ্রহীতাদের যথাযথভাবে নিবন্ধন সেবা প্রদান ব্যাহত হওয়া • সরকারের রাজস্ব হারানো • ভূমি নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ এবং তদের ওপর জনগণের আস্থার ঘাটতি • সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৮.১ উপসংহার

যথাযথভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য হস্তান্তরের দলিলটি যথাযথ ও আইনসিদ্ধভাবে নিবন্ধিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর সুষ্ঠুভাবে দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবীশ ও দলিল লেখকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিবন্ধন বিভাগ সরকারের অন্যতম রাজস্ব আহরণকারী খাত বা উৎস। কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল যখন নিবন্ধিত হয় তখন নিয়ম অনুসারে উক্ত সম্পদের উপর আরোপিত আদায়যোগ্য সকল সরকারি ফিস (খাজনা, পৌর কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদভাবে পরিশোধ করা হয়েছে কিনা সেসম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বা পরিশোধ না হয়ে থাকলে নিবন্ধনের সময়ে সেকল ফিস এবং প্রযোজ্য নিবন্ধন ফি পরিশোধ করেই একটি দলিল নিবন্ধিত হয়। অর্থাৎ এই বিভাগ নিবন্ধন ফিস আদায়ের পাশাপাশি সরকারের আরো অনেক বিভাগের ফিস আদায়ও নিশ্চিত করে। কিন্তু এ গবেষণায় উঠে এসেছে যে সরকারের অন্যতম রাজস্ব আহরণকারী খাত বা উৎস স্বত্ত্বেও এ বিভাগটি কিছুটা অবহেলিত রয়েছে। আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করতে হচ্ছে যা এখানে বিরাজমান দুর্নীতিকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। নানা সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ সত্ত্বেও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলো দলিল নিবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে নিবন্ধন বিভাগের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

এ গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে দলিল নিবন্ধনের কাজে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের মাত্রা বা প্রবণতা অত্যন্ত বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে একটি যোগসাজশ বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কিছু সেবাগ্রহীতাদেরও এই যোগসাজশের অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে এই অংশীজনরা নানাভাবে একে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের এই যোগসাজশের দুর্নীতির শিকার হতে দেখা যায় এবং তাদেরকে জিম্মি করা হয়। দেখা যায় যে অতি সাধারণ ও বৈধ দলিল নিবন্ধনের জন্যও তাদেরকে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনে বাধ্য করা হচ্ছে। দলিল নিবন্ধনে বিদ্যমান দুর্নীতির ক্ষেত্রে একটি চেইন বা প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয়। এটি হচ্ছে: সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী দলিল লেখকদের জিম্মি করে টাকা নেয় এবং এরা একে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে এবং উভয় পক্ষই লাভবান হয়। অপরদিকে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করে টাকা নেয় এবং এখানেও কিছু ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ লাভবান হয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যে কোনো কাজে সেবাগ্রহীতাদের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ তো দিতেই হচ্ছে তবে কাজটি যদি অবৈধ, অসাধু বা নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে করা হয় তখন ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সাধারণ সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি হয়। দলিল নিবন্ধন ফি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সচেতনতারও অভাব রয়েছে। ফলে তারা সহজেই দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে আর্থিক দুর্নীতির সাথে সকল অংশীজনের পারস্পরিক যোগসাজশ থাকায় জবাবদিহিতা কাঠামোর কার্যকর হচ্ছে না। ভূমি নিবন্ধন সেবার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির উপস্থিতি ও কার্যকরজবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ঘাটতির কারণে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে। এ পরিস্থিতে সেবাগ্রহীতা ও সরকার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকার কারণে যথাযথ ভূমি নিবন্ধন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সার্বিকভাবে আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৮.২ সুপারিশ

সুষ্ঠভাবে দলিল নিবন্ধনের মাধ্যমে জনগণকে সহজ, সময়াবদ্ধ, দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত সেবা তথা সর্বোৎকৃষ্ট নিবন্ধন সেবা প্রদান, এ সম্পর্কিত জনগণের আস্থা বৃদ্ধি, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে:

আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

১. দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইনি ও পদ্ধতিগত সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে-

- ভূমি দলিল নিবন্ধনের পর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ দ্রুত উপজেলা ভূমি অফিসে পাঠানো এবং উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান দ্রুত হালনাগাদ করে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- নকলনবীশ নিয়োগ বা তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা নিবন্ধন আইনে বিধিবদ্ধ করতে হবে

- 'সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজার মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা-২০১০' সংস্কার করে বাস্তব মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে
- নিবন্ধন 'ফি' বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং সেবাগ্রহীতাদের সুবিধা বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনঃনির্ধারণ (বিশেষ করে কমানোর) করতে হবে

২. জমির মালিকানা পরিবর্তনের দলিল করার ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার ভূমি, সেটেলমেন্ট অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস যুক্ত থাকে। দেশের পরিবর্তনশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা সাপেক্ষে যথাযথভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ও দলিল নিবন্ধনের জন্য সরকারের এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় বৃদ্ধিতে একক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ লক্ষ্যে ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ও এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে হবে

৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে দেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও জনবল নিশ্চিত করতে হবে

৪. জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী এবং নকলনবীশদের নিয়োগ, কর্মচারীদের বদলি ও পদোন্নতি এবং দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রাপ্তি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে

৫. জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

৬. দলিল নিবন্ধন, দলিলের নকল তল্লাশী, উত্তোলন এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মত সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে

ভূমি নিবন্ধন সেবায় ডিজিটাইজেশন

৭. ভূমি নিবন্ধন সেবা সহজীকরণ, জনবান্ধব এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে এই সেবা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজেশন করতে হবে - এ লক্ষ্যে-

- ই-নিবন্ধন ব্যবস্থা দ্রুত চালু করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে
- হালনাগাদ রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ানের একটি কেন্দ্রিয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের সাথে সমন্বিত থাকবে এবং প্রতিটি নাগরিকের ভূমির বিদ্যমান খতিয়ানের তথ্য প্রদর্শন করবে এবং এই তথ্যভান্ডারে সাব-রেজিস্ট্রারদের তাৎক্ষণিক অভিগম্যতা থাকবে

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৮. দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতে আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি এবং তালিকা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে - এছাড়া নাগরিক সনদ হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করতে হবে এবং অফিস প্রাঙ্গণে তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন করতে হবে

৯. নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ওপর নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিতকরণ, নিবন্ধন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং নিবন্ধন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

১০. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবীশ ও দলিল লেখকদের কার্যক্রম ও আচরণ নিয়মিত কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অফিসে আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি, প্রতি বছর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদ আয় ও সম্পত্তির বিবরণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে

১১. সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে

১২. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১৩. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে আনুষ্ঠানিক এবং যথাযথভাবে সুনির্দিষ্ট ফলোআপসহ গণশুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ

১৪. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবীশ, দলিল লেখক এবং ভূমি দলিল নিবন্ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের যেকোনো অনিয়ম-দুর্নীতি এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে 'এথিকস কমিটি' গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, নিবন্ধন অধিদপ্তর, দেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবীশ, দলিল লেখক, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজকে একসাথে কাজ করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

The Registration Act, 1908, available at http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=90

আইন ও বিচার বিভাগ ২০১৪, ***নিবন্ধন ম্যানুয়াল ২০১৪***, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় , ঢাকা।

আইন ও বিচার বিভাগ ২০১৭, ***বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭,*** আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় , ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

খান. মোঃ, ইসলাাম নজরুল ২০০৮ ***'ভূমি আইনের সহজপাঠ'*** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, ঢাকা; ISBN:984-300-001294-6.

'জমি-জমার কথা' ২০১৪ ' শামসুল হুদা সম্পাদিত, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

Transparency International Bangladesh (2015), ***'Land Management and Services in Bangladesh: Governance Challenges and Way forward'*** Dhaka.

Transparency International Bangladesh (2017), ***'ACC's Public Hearing as a Means of Controlling Corruption: Effectiveness, Challenges and Way Forward'*** Dhaka.